প্রবন্ধ পুস্তক।



শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।



কাঁটালপাড়া।

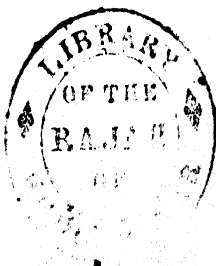
বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



মূল্য ৸৵০ মাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয়।				পৃষ্ঠা।
বাঙ্গালির বাহুবল	...	...	...	১
ভালাবাসার অত্যাচার		...	...	১৪
জ্ঞান	...	...	...	২৫
সাংখ্যদর্শন	...	...	...	৩৫
হিন্দুধর্ম্মের নৈসর্গিক মূল		...	...	৭১
ভারত কলঙ্ক	...	...	...	৯১
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা			...	১০৯
প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি		..	...	১২১
প্রচীনা এবং নবীনা		...	...	১৩২
তিন রকম	...	...	...	১৪৩
বুড়া বয়সের কথা	...	...	...	১৪৯



বিজ্ঞাপন।

এই গ্রন্থে যে কয়টি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইল তাহা সকলই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন কোন প্রবন্ধের স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিত্যাগ করা গিয়াছে। কখনও বা প্রবন্ধের নাম পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে।

এই জাতীয় আরও কয়েকটি মৎপ্রণীত প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। নানা কারণে সে গুলি এক্ষণে পুনর্মুদ্রাঙ্কনের অযোগ্য বিবেচনা করিলাম।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাঙ্গালির বাহুবল।

বাঙ্গালির এক্ষণে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। বাঙ্গালি সর্ব্বদা উন্নতির জন্য ব্যস্ত। অনেকে তদ্বিষয়ে বিশেষ গুরুতর আশা করেন না। কেননা বাঙ্গালির বাহুবল নাই। বাহুবল ভিন্ন উন্নতি নাই, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস।

বাঙ্গালির বাহুবল নাই, ইহা সত্য কথা। কখন হইবে কি না, এ কথার মীমাংসার পূর্ব্বে দেখা যাউক কখন ছিল কি না।

বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত নাই। যাহা বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত বলিয়া পাঠশালার বালকগণ কর্ত্তৃক অধীত হইয়া থাকে, তাহা বাস্তবিক বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত নহে, বাঙ্গালায় মুসলমানদিগের পুরাবৃত্ত। উহা বাঙ্গালির দাসত্বের পুরাবৃত্ত; বাঙ্গালার অধঃপাতের ইতিহাস। সত্য বটে, যেমন বাঙ্গালার পূর্ব্বাবস্থার কোন লিখিত বৃত্ত নাই, সেইরূপ ভারতবর্ষের অন্যান্যাংশেরও নাই। নাই, কিন্তু আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুসন্ধানে অনেক কথা জানিয়াছেন। পশ্চিমভারতের, মধ্যভারতের, দক্ষিণ ভারতের, পূর্ব্ব গৌরবের অনেক প্রমাণ পাইয়াছেন। পুরাবৃত্ত

থাক্ বা না থাক্, ইহা জানা আছে, যে মৌর্য্যবংশীয় ও গুপ্ত-বংশীয় সম্রাটেরা হিমাচল হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত একচ্ছত্রে শাসিত করিয়াছিলেন; জানা আছে দিগ্বিজয়ী গ্রীকজাতি শতদ্রু অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই; জানা আছে সেই বীরেরা, আসিয়ার মধ্যে ভারতবাসীরই বীরত্বের প্রশংসা করিয়া ছিলেন; জানা আছে যে তাঁহারা চন্দ্রগুপ্ত দ্বারা ভারত-ভূমি হইতে উন্মূলিত হইয়াছিলেন; জানা আছে, হর্ষবর্দ্ধনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহুশত করপ্রদ রাজা অনুসরণ করিতেন; জানা আছে, দিগ্বিজয়ী আরবেরা তিনশত বৎসরে পশ্চিম ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারে নাই। এইরূপ আরও অনেক কথা জানা গিয়াছে। পশ্চিম ভারতবর্ষীয়দিগের বীর্য্যবত্তার অনেক চিহ্ন অদ্যাপি ভারতভূমে আছে।

বাঙ্গালার পূর্ব্ব বীরত্ব, পূর্ব্ব গৌরবের কি জানা আছে? কেবল ইহাই জানি, যে যখন পশ্চিম ভারতে বেদ সৃষ্ট ও অধীত হইতেছিল, উপনিষদ্ সকল প্রণীত হইতে ছিল, অযোধ্যার ন্যায় সর্ব্বসম্পদশালিনী নগরীসকল স্থাপিতা এবং অলঙ্কৃতা হইতেছিল—বাঙ্গালা তখন অনার্য্য ভূমি, আর্য্যগণের বাসের অযোগ্য বলিয়া পরিত্যক্ত।(১) কেবল ইহাই জানি যে যখন উত্তর ভারতে, সমস্ত আর্য্য বীরগণ একত্রিত হইয়া কুরুক্ষেত্রজিত রাজ্যখণ্ড সকল বিভাগ করিতেছিলেন, যখন পশ্চিমে মন্বাদি, অমর, অক্ষয় ধর্ম্মশাস্ত্র সকল প্রণীত হইতে-ছিল, তখন বঙ্গদেশে পৌণ্ড্র প্রভৃতি অনার্য্যজাতির বাস। প্রাচীন কাল দূরে থাকুক, যখন মধ্যকালে চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েন্থ সাঙ বঙ্গদেশপর্য্যটনে আসেন, তখন তিনি দেখিয়া-ছিলেন, যে এই প্রদেশ গৌরবশূন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। বঙ্গদেশের পূর্ব্বগৌরব কোথায়?

(১) বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার" দেখ।

তবে, ইহার পরে শুনা যায়, যে পালবংশীয় ও সেন-বংশীয় রাজগণ, বৃহৎ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং গৌড় নগরী বড় সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিল। কিন্তু এমন কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না যে তাঁহারা এই বাহুবলশূন্য বাঙ্গালিজাতি এবং তাঁহাদিগের প্রতিবাসী তদ্রূপ দুর্ব্বল অনার্য্যজাতিগণ ভিন্ন অন্য কাহাকে আপন অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। এই মাত্র প্রমাণ আছে বটে, যে মুঙ্গের পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অধিকার-ভুক্ত ছিল। অন্যত্র তাঁহাদিগের অধিকার বিস্তার সম্বন্ধে তিনটি মাত্র কথা আছে, তিনটিই অমূলক।

প্রথম, কিম্বদন্তী আছে, যে দিল্লীতে বল্লালসেনের অধিকার ছিল। এ কথা একখানি দেশীগ্রন্থে লিখিত থাকিলেও নিতান্ত অমূলক, এবং জেনেরল কনিঙহাম সাহেব তাহার অমূলকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বঙ্গেশ্বর বল্লাল সেনের অধিকার দিল্লী-পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, এরূপ বৃহৎ ব্যাপার ঘটিত, যে অবশ্য একখানি সামান্য গ্রন্থে উল্লেখ ভিন্ন তাহার অন্য প্রমাণ কিছু পাওয়া যাইত। বঙ্গ হইতে দিল্লীর মধ্যে যে বহুবিস্তৃত প্রদেশ, তথায় বঙ্গপ্রভুত্বের কোন কিম্বদন্তী, কোন উল্লেখ, কোন চিহ্ন অবশ্য থাকিত। কিছু নাই।

দ্বিতীয়। ১৭৯৪ সালে গৌড়েশ্বর মহীপালরাজের একখানি শাসন কাশীতে পাওয়া গিয়াছিল। তাহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন কাশীপ্রদেশ মহীপালের রাজ্যভুক্ত ছিল। এক্ষণে সেমত পরিত্যক্ত হইতেছে। (২)

তৃতীয়। লক্ষ্মণসেনের দুই একখানি তাম্রশাসনে তাঁহাকে

---

(২) See Introduction to Sherring's Sacred City of the Hindus, by F. E. Hall. p. xxxv, Note 2.

প্রায় সর্ব্বদেশজেতা বলিয়া বর্ণনা করা আছে। পড়িলেই বুঝা যায়, যে সে সকল কথা চাটুকার কবির কল্পনা মাত্র।

অতএব পূর্ব্বকালে বাঙ্গালিরা যে বাহুবলশালীছিলেন, এমত কোন প্রমাণ নাই। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষস্থ অন্যান্য জাতি যে বাহুবলশালী ছিলেন,এমত প্রমাণ অনেক আছে; কিন্তু বাঙ্গালিদিগের বাহুবলের কোন প্রমাণ নাই। হোয়েন্থ সাঙ "সমতট" রাজ্যবাসীদিগের যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িয়া বোধ হয় পূর্ব্বে বাঙ্গালিরা এইরূপ খর্ব্বাকৃত, দুর্ব্বলগঠন ছিল।

বাঙ্গালিদিগের বাহুবল কখন ছিল না, কিন্তু কখন হইবে কি?

বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎ উক্তির নিয়ম এই যে যেরূপ যে অবস্থায় হইয়াছে, সেই অবস্থায় সেইরূপ আবার হইবে। যে যে কারণে বাঙ্গালি চিরকাল দুর্ব্বল,সেইসেই কারণ যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন বাঙ্গালিরা বাহুবলশূন্য থাকিবে। সে সকল কারণ কি?

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের মতে, সকলই বাহ্য প্রাকৃতিক ফল। বাঙ্গালির দুর্ব্বলতাও বাহ্য প্রকৃতির ফল। ভূমি, জলবায়ু এবং দেশাচারের ফলে বাঙ্গালিরা দুর্ব্বল, ইহাই প্রচলিত মত। সেই সকল মতগুলির, সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিতেছি।

কেহ কেহ বলেন, এদেশের ভূমি অত্যন্তউর্ব্বরা—অল্প পরিশ্রমেই শস্যোৎপাদন হইতে পারে। সুতরাং বাঙ্গালিকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। পরিশ্রম অধিক না করিলে শরীরে বলাধান হয় না। বঙ্গভূমির উর্ব্বরতা বঙ্গবাসীর দুর্ব্বলতার কারণ।

তাঁহারা আরও বলেন যে ভূমি উর্ব্বরা হইলে, আহারের জন্য মৃগয়া পশুহননাদির আবশ্যকতা হয় না। পশুহনন বাহু-

সায়, বল সাহস ও পরিশ্রমের কার্য্য; মনুষ্যকে সর্ব্বদা পরিশ্রমে নিরত রাখে,এবং তাহাতে ঐ সকল গুণ অভ্যস্ত এবং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।

দেখা যাইতেছে যে বঙ্গদেশ ভিন্ন আরও উর্ব্বরদেশ আছে। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক অংশ বঙ্গদেশাপেক্ষায় উর্ব্বরতায় ন্যূন নহে। সে সকল দেশের লোক দুর্ব্বল নহে।

অনেকে বলেন, জলবায়ুর দোষে বাঙ্গালিরা দুর্ব্বল। যে দেশের বায়ু আর্দ্র অথচ তাপযুক্ত, সে দেশের লোক দুর্ব্বল। কেন হয়, তাহা শারীরতত্ত্ববিদেরা ভাল করিয়া বুঝান নাই। বায়ুর আর্দ্রতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত টীকা পাঠ করিলেই সংশয় দূর হইতে পারে।(৩) আর যাঁহারা আরব প্রভৃতি জাতির বীর্য্য

---

(৩) The high humidity of the atmosphere in Bengal, and more especially in its eastern districts, has become proverbial; and if the term be used in reference to the quantity of vapour in the air as measured by its tension, the popular belief is justified by observations. But if used in the more usual sense of relative humidity, that is, as referring to the percentage of vapour in the air in proportion to that which would saturate it, the average annual humidity of a large part of Bengal is sensibly lower than that of England. A comparative table is subjoined of the mean vapour tension and relative humidity of London and Calcutta in each month of the year, and the mean of the whole year; the data for the former place being taken from an essay on the climate of London by the late Professor Daniell, those for the latter from the results of the hourly observations registered at Surveyer General's Office Calcutta, and computed in the Meteorological Office of Bengal. The former are deduced from 17 year's, the latter from 14 year's observations.

জানেন তাঁহারা তাপকে দৌর্ব্বল্যের কারণ বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

Mean Vapour Tension in Thousandths of an inch.

	Jan.	Feb.	Mar.	Apl.	May.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dc.	Average.
London.	·245	·264	·280	·315	·340	·490	·534	·530	·468	·389	·310	·281	·376 inch.
Calcutta	·487	·549	·695	·805	·889	·947	·954	·950	·950	·828	·605	·489	·762.

Mean Relative Humidity:—Saturation 100.

	Jan.	Feb.	Mar.	Apl.	May.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dc.	year.
London.	97	94	89	84	82	82	84	85	91	94	96	97	89
Calcutta	71	68	67	69	73	81	85	86	85	78	73	72	76

The quantity of vapour in the air of Calcutta, relative to the dry air, is then, on the average of the year, about twice as great as in that of London; but the relative humidity of the former equals that of the latter only in the three first months of the rains, which are among the driest months of all

অনেকে মোটামুটি বলেন যে জলসিক্ত তাপযুক্ত বায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর, তন্নিবন্ধন বাঙ্গালিরা নিত্য রুগ্ন, এবং তাহাই বাঙ্গালির দুর্ব্বলতার কারণ।

অনেকে বলেন, অন্নই অনর্থের মূল। এদেশের ভূমির প্রধান উৎপাদ্য চাল, এবং এ দেশের লোকের খাদ্য ভাত। ভাত অতি অসার খাদ্য, তাহাতেই বাঙ্গালির শরীর গঠে না। এজন্য "ভেতো বাঙ্গালি" বলিয়া বাঙ্গালির কলঙ্ক হইয়াছে।

শারীরতত্ত্ববিদেরা বলেন, যে খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্পাদন করিলে দেখা যায়, যে তাহাতে ষ্টার্চ্চ, গ্লুটেন প্রভৃতি কয়েকটি সামগ্রী আছে। গ্লুটেন নাইট্রজেন-প্রধান সামগ্রী। তাহাতেই শরীরের পুষ্টি। মাংসপেশী প্রভৃতির পুষ্টির জন্য এই সামগ্রীর বিশেষ প্রয়োজন। ভাতে, ইহা অতি অল্প পরিমাণে থাকে। মাংসে বা গমে ইহা অধিক পরিমাণে থাকে। এই জন্য মাংসভোজী এবং গোধূম-ভোজীদিগের শরীর অধিক বলবান্—"ভেতো" জাতির শরীর দুর্ব্বল। ময়দায় গ্লুটেন, শতভাগে দশভাগ থাকে; (৪) মাংসে (Fibrin বা Musculine) ১৯ ভাগ, (৫) এবং ভাতে ৭'কি ৮ ভাগ মাত্র থাকে (৬)। সুতরাং বাঙ্গালি দুর্ব্বল হইবে বৈ কি?

কেহ কেহ বলেন, বাল্যবিবাহই বাঙ্গালির পরমশত্রু—বাল্যবিবাহের কারণেই বাঙ্গালির শরীর দুর্ব্বল। যে সন্তানের মাতা পিতা অপ্রাপ্তবয়ঃ, তাহাদের শরীর ও বল চিরকাল

European climate.—Bengal Administration Report, 1872-73, Statistical Summary page. 5-6.

(৪) Johnstone's *Chemistry of Common* Life Vol. 1, p 100.

(৫) Ibid p 125,

(৬) Ibid 101.

অসম্পূর্ণ থাকিবে, এবং যাহারা অল্পবয়স হইতে ইন্দ্রিয়সুখে নিরত, তাহারা বলবান্ হইবার সম্ভাবনা কি?

বাঙ্গালি মনুষ্যেরই কি, বাঙ্গালি পশুরই কি, দুর্ব্বলতা যে জলবায়ু বা মৃত্তিকার গুণ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু জলের, বা বায়ুর বা মৃত্তিকার কোন্ দোষের এই কুফল, তাহা কোন পণ্ডিতে অবধারিত করেন নাই।

কিন্তু এই দুর্ব্বলতার যে সকল কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বা উল্লিখিত হইল, তাহাতে এমত ভরসা করা যায় না, যে অল্পকালে সে দুর্ব্বলতা দূর হইবে। তবে, ইহাও বলা যাইতে পারে, যে এমত কোন নিশ্চয়তা নাই, যে কোন কালে, এ সকল কারণ অপনীত হইতে পারে না। বাল্যবিবাহই যদি এ দুর্ব্বলতার কারণ হয়, তবে এমন ভরসা করা যাইতে পারে যে সামাজিক রীতির পরিবর্ত্তনে এ কুপ্রথা সমাজ হইতে দূর হইবে; এবং বাঙ্গালির শরীরে বলসঞ্চার হইবে। যদি চাল এ অনিষ্টের কারণ হয়, তবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে যে গোধুমাদির চাস এ দেশে বৃদ্ধি করাইলে, বাঙ্গালি ময়দা খাইয়া বলিষ্ঠ হইবেণ এমন কি কালে জল বায়ুরও পরিবর্ত্তন হইতে পারে। এক্ষণে মনুষ্যবাসের অযোগ্য যে সুন্দরবন তাহা এককালে বহুজনাকীর্ণ ছিল, এমত প্রমাণ আছে। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, যে ইউরোপীয় অনেক প্রদেশ, এক্ষণকার অপেক্ষা উষ্ণতর ছিল, এবং তথায় সিংহ হস্তী প্রভৃতি উষ্ণদেশবাসী জীবের আশ্রয় ছিল। আবার এককালে সেই সকল প্রদেশ হিমশিলায় নিমগ্ন ছিল। সে সকল যুগান্তরের কথা—সহস্র সহস্র যুগে সে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। কিন্তু ঐতিহাসিক কালের মধ্যেও জলবায়ু শীততাপের পরিবর্ত্তনের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে রোমনগরীর নিম্নে টৈবর নদের মধ্যে বরফ

জমিয়া যাইত। এবং এক সময়ে ক্রমাগত চাল্লিশদিন তাহাতে বরফ জমিয়া ছিল। কৃষ্ণসাগরে (Euxine Sea) অবিদ নামক কবির জীবনকালে, প্রতি বৎসর শীত ঋতুতে বরফ জমিয়া যাইত। এবং রীণ এবং রণ নামক নদীদ্বয়ের উপরে তৎসময়ে বরফ এরূপ গাঢ় জমিত, যে তাহার উপর দিয়া বোঝাই গাড়ি চলিত। এক্ষণে রোমে বা কৃষ্ণসাগরে, বা উক্ত নদীদ্বয়ে বরফের নাম মাত্র নাই। কেহ কেহ বলেন, কৃষিকার্য্যের আধিক্যে, বন কাটায়, মৃত্তিকা ভগ্ন করায়, এবং ঝিল বিল শুষ্ক করায় এ সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যদি কৃষিকার্য্যের আধিক্যে শীতপ্রদেশ উষ্ণ হয়, তবে উষ্ণপ্রদেশ শীতল হইবার কারণ কি? গ্রীনলণ্ড এককালে এরূপ তাপযুক্ত প্রদেশ ছিল, যে ইহাতে উদ্ভিদের বিশেষ আধিক্য এবং শোভা ছিল, এবং সেই জন্য উহার নাম গ্রীনলণ্ড হইয়াছিল। এক্ষণে সেই গ্রীনলণ্ড সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র হিমশিলায় মণ্ডিত! এই দ্বীপের পূর্ব্ব উপকূলে, বহুসংখ্যক ঐশ্বর্য্যশালী উপনিবেশ ছিল, —এক্ষণে সে উপকূলে কেবল বরফের রাশি, এবং সেই সকল উপনিবেশের চিহ্ন মাত্র নাই। লাব্রাডর, এক্ষণে শৈত্যাধিক্যের জন্য বিখ্যাত—কিন্তু যখন সহস্র খ্রীষ্টাব্দে নর্ম্মেনেরা তথায় গমন করেন, তখন ইহারও শীতের অল্পতা দেখিয়া তাঁহারা প্রীত হইয়াছিলেন, এবং ইহাতে দ্রাক্ষা জন্মিত বলিয়া ইহার দ্রাক্ষাভূমি নাম দিয়াছিলেন। (৮)

এ সকল পরিবর্ত্তনের অতি দূর সম্ভাবনা। না ঘটিবারই সম্ভাবনা। বাঙ্গালির শারীরিক বল চিরকাল এইরূপ থাকিবে ইহা এক প্রকার সিদ্ধ, কেন না দুর্ব্বলতার নিবার্য্য কারণ কিছু দেখা যায় না।

(৮) *The Scientific American.*

তবে ক বাঙ্গালির ভরসা নাই? এ প্রশ্নে আমাদের দুইটী উত্তর আছে।

প্রথম উত্তর। শারীরিক বলই অদ্যাপি পৃথিবী শাসন করিতেছে বটে। কিন্তু শারীরিক বল পশুর গুণ; মনুষ্য অদ্যাপি অনেকাংশে পশুপ্রকৃতিসম্পন্ন, এজন্য শারীরিক বলের আজিও এতটা প্রাদুর্ভাব। শারীরিক বল উন্নতি নহে। উন্নতির উপায় মাত্র। এ জগতে বাহুবল ভিন্ন কি উন্নতির উপায় নাই?

বাহুবলকে উন্নতির উপায়ও বলিতে পারি না। বাহুবলে কাহারও উন্নতি হয় না। যে তাতার, ইউরোপ, আসিয়া, জয় করিয়াছিল, সে কখন উন্নতাবস্থায় পদার্পণ করিল না। তবে বাহুবল উন্নতির পক্ষে এই জন্য আবশ্যক যে, যে সকল কারণে উন্নতির হানি হয়, সে সকল উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করা চাই। সেই জন্য বাহুবলের প্রয়োজন। কিন্তু যেখানে সে প্রয়োজন নাই, সেখানে বাহুবলব্যতীতও উন্নতি ঘটে। দুইটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

১ম। স্কটলণ্ড, অতি ক্ষুদ্র রাজ্য। কোনকালে বাহুবলে বিশেষ বলবান্ নহে। ইংলণ্ডীয় রাজগণ সর্ব্বদা ইহার উপর অত্যাচার করিতেন; স্কটলণ্ড কখন কষ্টে আত্মরক্ষা করিত, কখন পারিত না। এজন্য স্কটলণ্ড যত দিন, ইংলণ্ড হইতে স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, ততদিন স্কট্‌লণ্ডের উন্নতি ইংলণ্ড হইতে অল্পতর হইয়াছিল। পরে ইংলণ্ডের প্রথম জেম্‌সের সময়ে, ইংলণ্ড স্কটলণ্ড এক রাজ্য হইল। স্কটলণ্ড আত্মরক্ষার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইল। তখন স্কটলণ্ডের উন্নতি অতি দ্রুতবেগে হইতে লাগিল। এক্ষণে স্কট্‌লণ্ড ইংলণ্ড হইতে কোন অংশে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত নহে। কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা কোন অংশে বাহুবল

বাড়ে নাই; স্কটেরা বাহুবলে বলবন্ত না হইয়াও উন্নত হই-য়াছে।

২য়। গারিবল্‌দির সময় হইতে ইটালী কিঞ্চিৎ বাহুবল প্রদর্শন করিয়াছে। সেও অল্পদিন। আজি কালির কথা ছাড়িয়া দিয়া, পূর্ব্বাবস্থা ধরিতে হয়। আধুনিক ইটালীকে ইউরোপের মধ্যে বিশেষ বাহুবলশূন্য রাজ্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু উন্নতিতে ইটালী, কোন ইউরোপীয় রাজ্যের অপেক্ষায় লঘু নহে। কতকগুলি লঘুচেতা লোক আছেন—এদেশে আছেন, ইউরোপেও আছেন, এবং মনুষ্যজাতির দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই লেখক, তাঁহারা বাহুবলকেই উন্নতি বলেন। তাঁহারা ইটালীয়দিগকে অত্যুন্নত জাতিমধ্যে না গণিলেও গণিতে পারেন। কিন্তু যে সকল সুখের সমবায়কে জাতীয় উন্নতি বলা যায়, তাহাতে ইটালী কোন দেশের অপেক্ষা ন্যূন নহে। বরং ইহা বলা যাইতে পারে, যে এই ইটালী ও স্কটলণ্ড, এই দুই বাহুবলবিহীন রাজ্যমধ্যে যত মহল্লোক জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, এত অল্পভূমির মধ্যে এত বহুসংখ্যক নরশ্রেষ্ঠ আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই।

ইটালীতেও বাহুবল ব্যতীত উন্নতি। এখানেও আত্ম-রক্ষার প্রয়োজন হয় নাই। পূর্ব্বে পোপের প্রতাপে, অধুনা ইউরোপীয় শক্তিসাম্য রক্ষার হেতু, প্রয়োজন হয় নাই। কেবল বিনিষিয়া, পরহস্তগত ছিল।

দ্বিতীয় উত্তরে, আমরা যাহা বলিতেছি বাঙ্গালার সর্ব্বত্র, সর্ব্ব নগরে, সর্ব্ব গ্রামে সকল বাঙ্গালির হৃদয়ে তাহা লিখিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালি শারীরিক বলে দুর্ব্বল—তাহাদের বাহুবল হইবারও সম্ভাবনা নাই—তবে কি বাঙ্গালির ভরসা

নাই? এ প্রশ্নে আমাদিগের উত্তর এই যে, শারীরিক বল বাহুবল নহে।

মনুষ্যের শারীরিক বল অতি তুচ্ছ। তথাপি হস্তী অশ্ব প্রভৃতি মনুষ্যের বাহুবলে শাসিত হইতেছে। মনুষ্যে মনুষ্যে তুলনা করিয়া দেখ। যে সকল পার্ব্বত্য বন্যজাতি হিমালয়ের পশ্চিমভাগে বাস করে, পৃথিবীতে তাহাদের ন্যায় শারীরিক বলে বলবান্ কে? এক এক জন মেওয়াওয়ালার চপেটাঘাতে, অনেক সেলর গোরাকে ঘূর্ণ্যমান হইয়া আঙ্গুর পেস্তার আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে দেখা গিয়াছে। তবে গোরা সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া, ভারত অধিকার করিল—কাবুলির সঙ্গে ভারতের কেবল ফলবিক্রয়ের সম্বন্ধ রহিল, কেন? অনেক ভারতীয় জাতি হইতে, ইংরেজেরা শারীরিক বলে লঘু। শারীরিক বলে, শীকেরা ইংরেজ অপেক্ষা বলিষ্ঠ। তথাপি শীক, ইংরেজের পদানত। শারীরিক বল, বাহুবল নহে।

উদ্যম, ঐক্য, সাহস, এবং অধ্যবসায় এই চারিটি একত্রিত করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল তাহাই বাহুবল। যে জাতির উদ্যম, ঐক্য, সাহস, এবং অধ্যবসায় আছে, তাহাদের শারীরিক বল যেমন হউক না কেন, তাহাদের বাহুবল আছে। এই চারিটি বাঙ্গালির কোন কালে নাই, এজন্য বাঙ্গালির বাহুবল, কোন কালে নাই।

কিন্তু সামাজিক গতির বলে, এ চারিটি বাঙ্গালি চরিত্রে সমবেত হওয়ার অসম্ভাবনা কিছুই নাই।

বেগবৎ অভিলাষ হৃদয়মধ্যে থাকিলে উদ্যম জন্মে। অভিলাষ মাত্রেই কখন উদ্যম জন্মে না। যখন অভিলাষ এরূপ বেগ লাভ করে, যে তাহার অপূর্ণাবস্থা বিশেষ ক্লেশকর হয়, তখন অভিলষিতের প্রাপ্তির জন্য উদ্যম জন্মে। অভিলাষের

অপূর্ত্তি জন্য যে ক্লেশ, তাহার এমন প্রবলতা চাহি যে, নিশ্চেষ্টতা এবং আলস্যের যে সুখ, তাহা তদভাবে সুখ বলিয়া বোধ না হয়। এরূপ বেগযুক্ত কোন অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে স্থান পাইলে, বাঙ্গালির উদ্যম জন্মিবে। ঐতিহাসিক কালমধ্যে এরূপ কোন বেগযুক্ত অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে কখন স্থান পায় নাই।

যখন বাঙ্গালির হৃদয়ে সেই এক অভিলাষ জাগরিত হইতে থাকিবে, যখন বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষের বেগ এরূপ গুরুতর হইবে, যে সকল বাঙ্গালিই তজ্জন্য আলস্য সুখ তুচ্ছ বোধ করিবে, তখন উদ্যমের সঙ্গে ঐক্য মিলিত হইবে।

সাহসের জন্য আর একটু চাই। চাই যে সেই জাতীয় সুখের অভিলাষ, আরও প্রবলতর হইবে। এত প্রবল হইবে যে তজ্জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনও শ্রেয়োবোধ হইবে। তখন সাহস হইবে।

যদি এই বেগবৎ অভিলাষ, কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে অধ্যবসায় জন্মিবে।

অতএব যদি কখন (১) বাঙ্গালির হৃদয়ে কোন জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয় (২) যদি বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়েসেই অভিলাষ প্রবল হয়, (৩) যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালির অবশ্য বাহুবল হইবে।

বাঙ্গালির এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, এ কথা বলিতে পারা যায় না। যে কোন সময়ে ঘটিতে পারে।



ভালবাসার অত্যাচার।

লোকের বিশ্বাস আছে, যে কেবল শত্রু, অথবা স্নেহ দয়া দাক্ষিণ্যশূন্য ব্যক্তিই আমাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। কিন্তু তদপেক্ষা গুরুতর অত্যাচারী যে আর এক-শ্রেণীর লোক আছে, তাহা সকল সময়ে আমাদের মনে পড়ে না। যে ভালবাসে সেই অত্যাচার করে। ভালবাসিলেই, অত্যাচার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি যদি তোমাকে ভালবাসি, তবে তোমাকে আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে, আমার কথা শুনিতে হইবে; আমার অনুরোধ রাখিতে হইবে। তোমার ইষ্ট হউক, অনিষ্ট হউক, আমার মতাবলম্বী হইতে হইবে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হয়, যে যে ভালবাসে সে, যে কার্য্যে তোমার অমঙ্গল, জানিয়া শুনিয়া তাহাতে তোমাকে অনুরোধ করিবে না। কিন্তু কোন্ কার্য্য মঙ্গলজনক, কোন্ কার্য্য অমঙ্গলজনক, তাহার মীমাংসা কঠিন; অনেক সময়েই দুই জনের মত এক হয় না। এমত অবস্থায় যিনি কার্য্যকর্ত্তা, এবং তাহার ফলভোগী, তাঁহার সম্পূর্ণ অধি-কার আছে, যে তিনি আত্মমতানুসারেই কার্য্য করেন; এবং তাঁহার মতের বিপরীত কার্য্য করাইতে রাজা ভিন্ন কেহই অধি-কারী নহেন। রাজাই কেবল অধিকারী এই জন্য, যে তিনি সমাজের হিতাহিতবেত্তা স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; কেবল তাঁহারই সদসৎ বিবেচনা অভ্রান্ত বলিয়া তাঁহাকে আমাদিগের প্রবৃত্তি দমনের অধিকার দিয়াছি; যে অধিকার তাঁহাকে দিয়াছি, সে অধিকার অনুসারে তিনি কার্য্য করাতে কাহারও প্রতি-

অত্যাচার হয় না। এবং সকল সময়ে এবং সকল বিষয়ে আমাদিগের প্রবৃত্তি দমন করিবার তাঁহারও অধিকার নাই; যে কার্য্যে অন্যের অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচনা করেন, তৎপ্রতি প্রবৃত্তির নিবারণেই তাঁহার অধিকার; যাহাতে আমার কেবল আপনারই অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচনা করেন, সে প্রবৃত্তি নিবারণে তিনি অধিকারী নহেন। যাহাতে কেবল আমার নিজের অনিষ্ট, তাহা হইতে বিরত হইবার পরামর্শ দিবার জন্য মনুষ্য মাত্রেই অধিকারী; রাজাও পরামর্শ দিতে পারেন, এবং যে আমাকে ভালবাসে, সেও পারে। কিন্তু পরামর্শ ভিন্ন আমাকে তদ্বিপরীত পথে বাধ্য করিতে কেহই অধিকারী নহেন। সমাজস্থ সকলেই অধিকার আছে, যে সকল কার্য্যই, পরের অনিষ্ট না করিয়া আপনাপন প্রবৃত্তি মত সম্পাদন করে। পরের অনিষ্ট ঘটিলেই ইহা স্বেচ্ছাচারিতা; পরের অনিষ্ট না ঘটিলেই ইহা স্বানুবর্ত্তিতা। যে এই স্বানুবর্ত্তিতার বিঘ্ন করে, যে পরের অনিষ্ট না ঘটিবার স্থানেও আমার মতের বিরুদ্ধে আপন মত প্রবল করিয়া তদনুসারে কার্য্য করায়, সেই অত্যাচারী। রাজা ও সমাজ, ও প্রণয়ী, এই তিন জনে এরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন।

রাজার অত্যাচার নিবারণের উপায় বহুকাল উদ্ভূত হইয়াছে। সমাজের এই অত্যাচার নিবারণ জন্য কোন কোন পূর্ব্ব পণ্ডিত ধৃতাস্ত্র হইয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের যত্ন ও বিচারদক্ষতা, অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাঁহার মাহাত্ম্যের পরিচয় দিবে। কিন্তু ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের জন্য যে কেহ কখন যত্নশীল হইয়াছেন, এমত আমাদিগের স্মরণ হয় না। কবিগণ সর্ব্বতত্ত্বদর্শী এবং অনন্ত জ্ঞানবিশিষ্ট, তাঁহাদের কাছে কিছুই বাদ পড়ে নাই। কৈকেয়ীর অত্যাচারে দশরথকৃত রামের নির্ব্বাসনে, দ্যূতাসক্ত যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ভ্রাতৃগণের নির্ব্বা-

সনে, এবং অন্যান্য শত শত স্থানে কবিগণ এই মহতী নীতি প্রতিপাদিতা করিয়াছেন। কিন্তু কবিগণ নীতিবেত্তা নহেন; নীতিবেত্তারা এ বিষয়ে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। যিনিই লৌকিক ব্যাপার সকল মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, তিনিই এ তত্ত্বের সমালোচনা যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে নিঃসংশয় হইবেন। কেন না এ অত্যাচারে প্রবৃত্ত অত্যাচারী অনেক। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা, ভার্য্যা, স্বামী আত্মীয়, কুটুম্ব, সুহৃৎ, ভৃত্য, যেই ভালবাসে, সেই একটু অত্যাচার করে, এবং অনিষ্ট করে। তুমি সুলক্ষণান্বিতা, সদ্বংশজা, সচ্চরিত্রা কন্যা দেখিয়া, তাহার পাণিগ্রহণ করিবে বাসনা করিয়াছ, এমন সময়ে, তোমার পিতা আসিয়া বলিলেন, অমুক বিষয়াপন্ন লোক, তাহার কন্যার সঙ্গেই তোমার বিবাহ দিব। তুমি যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে তুমি এবিষয়ে পিতার আজ্ঞাপালনে বাধ্য নহ, কিন্তু পিতৃপ্রেমে বশীভূত হইয়া, সেই কালকূটরূপিণী ধনিকন্যা বিবাহ করিতে হইল। মনে কর, কেহ দারিদ্র্যপীড়িত, দৈবানুকম্পায় উত্তম পদস্থ হইয়া দূরদেশে যাইয়া, দারিদ্র্য মোচনের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে মাতা, তাহাকে দূরদেশে রাখিতে পারিবেন না বলিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন, তাহাকে যাইতে দিলেন না, সে মাতৃপ্রেমে বদ্ধ হইয়া নিরস্ত হইল, মাতার ভালবাসার অত্যাচারে সে আপনাকে চিরদারিদ্র্যে সমর্পণ করিল। কৃতী সহোদরের উপার্জ্জিত অর্থ, অকর্ম্মা অপদার্থ সহোদর নষ্ট করে, এটী নিতান্তই ভালবাসার অত্যাচার, এবং হিন্দুসমাজে সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে। ভার্য্যার ভালবাসার অত্যাচারের কোন উদাহরণ, নব্যবঙ্গবাসিদিগের কাছে প্রযুক্ত করা আবশ্যক কি? আর স্বামীর অত্যাচার সম্বন্ধে, ধর্ম্মতঃ এটুকু বলা কর্ত্তব্য, যে

কতকগুলি ভালবাসার অত্যাচার বটে, কিন্তু অনেক গুলিই বাহুবলের অত্যাচার।

যাহাহউক, মনুষ্যজীবন, ভালবাসার অত্যাচারে পরিপূর্ণ। চিরকাল মনুষ্য অত্যাচারপীড়িত। প্রথমাবস্থায় বাহুবলের অত্যাচার; অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে যেই বলিষ্ঠ সেই পরপীড়ন করে। কালে এই অত্যাচার, রাজার অত্যাচার এবং অর্থের অত্যাচারে পরিণত হয়; কোন সমাজে কখন একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দ্বিতীয়াবস্থায়, ধর্ম্মের অত্যাচার; তৃতীয়াবস্থায়, সামাজিক অত্যাচার; এবং সকল অবস্থাতেই ভালবাসার অত্যাচার। এই চতুর্ব্বিধ পীড়নের মধ্যে, প্রণয়ের পীড়ন কাহারও অপেক্ষা হীনবল বা অল্পানিষ্টকারী নহে। বরং ইহা বলা যাইতে পারে, যে রাজা, সমাজ বা ধর্ম্মবেত্তা কেহই প্রণয়ীর অপেক্ষা বলবান্ নহেন, বা কেহ তেমন সদা সর্ব্বক্ষণ সকল কাজে আসিয়াই হস্তক্ষেপণ করেন না—সুতরাং প্রণয়ের পীড়ন যে সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী ইহা বলা যাইতে পারে। আর অন্য অত্যাচারকারীকে নিবারণ করা যায়, অন্য অত্যাচারের সীমা আছে। কেন না অন্যান্য অত্যাচারকারীর বিরোধী হওয়া যায়। প্রজা, প্রজাপীড়ক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে; কখনও মস্তকচ্যুত করে। লোকপীড়ক সমাজকে পরিত্যাগ করা যায়। কিন্তু ধর্ম্মের পীড়নে এবং স্নেহের পীড়নে নিষ্কৃতি নাই—কেন না ইহাদিগের বিরোধী হইতে প্রবৃত্তিই জন্মে না। হরিদাস বাবাজী পাঁটার বাটি দেখিলে কখন কখন লাল ফেলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কখন গো[illegible]র সম্মুখে মাংসভোজনের ঔচিত্য বিচার করিতে ইচ্ছা করেন না—কেন না, জানেন, যে ইহলোকে যতই কষ্ট পান না কেন, বাবাজী পরলোকে গোলোক প্রাপ্ত হইবেন।

মনুষ্য যে সকল অত্যাচারের অধীন, সে সকলের ভিত্তিমূল

মনুষ্যের প্রয়োজনে। জড়পদার্থেকে আয়ত্ত না করিতে পারিলে মনুষ্যজীবন নির্ব্বাহ হয় না, এজন্য বাহুবলের প্রয়োজন। এবং সেই জন্যই বাহুবলের অত্যাচারও আছে। বাহুবলের ফল বৃদ্ধি করিবার জন্য, সমাজের প্রয়োজন; এবং সমাজের অত্যাচারও সঙ্গে সঙ্গে। যেমন পরস্পরে সমাজবন্ধনে বদ্ধ না হইলে, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হয় না, তেমনি পরস্পরে আন্তরিক বন্ধনে বদ্ধ না হইলে, মনুষ্যজীবনের সুনির্ব্বাহ হয় না। অতএব সমাজের যেরূপ প্রয়োজন, প্রণয়েরও তদ্রূপ বা ততোধিক প্রয়োজন। এবং বাহুবলের বা সমাজের অত্যাচার আছে বলিয়াই যেমন বাহুবল বা সমাজ মনুষ্যের ত্যাজ্য বা অনাদরণীয় হইতে পারে না, প্রণয়ের অত্যাচার আছে বলিয়াই তাহাও ত্যাজ্য বা অনাদরণীয় হইতে পারে না। অপিচ যেমন বাহুবল বা সমাজবলকে অত্যাচারী দেখিয়া তাহাকে পরিত্যক্ত বা অনাদৃত না করিয়া, মনুষ্য, ধর্ম্মের দ্বারা তাহার শমতার চেষ্টা পাইয়াছে, প্রণয়ের অত্যাচারও সেইরূপ ধর্ম্মের দ্বারা শমিত করিতে যত্নকরা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মেরও অত্যাচার আছে বটে, এবং ধর্ম্মের অত্যাচার শমতার জন্য যদি আরও কোন শক্তি প্রযুক্ত হয়, তাহারও অত্যাচার ঘটিবে, কেননা অত্যাচার শক্তির স্বভাবসিদ্ধ। যদি ধর্ম্মের অত্যাচার শমতায় সক্ষম কোন শক্তি থাকে, তবে জ্ঞান সেই শক্তি। কিন্তু জ্ঞানেরও অত্যাচার আছে। তাহার উদাহরণ, হিতবাদ এবং প্রত্যক্ষবাদ। এতদুভয়ের বেগে মনুষ্যহৃদয়সাগরে অনল্প ভাগ চড়া পড়িয়া যাইতেছে। বোধ হয় জ্ঞান ব্যতীত [illegible]নের অত্যাচার শাসনের জন্য অন্য কোন শক্তি যে মনুষ্যকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইবে, এক্ষণে এমন বিবেচনা হয় না।

সেইরূপ ইহাও বলা যাইতে পারে, যে প্রণয়ের দ্বারাই

প্রণয়ের অত্যাচার শমিত হওয়াই সম্ভব। এ কথা যথার্থ, স্বীকার করি। স্নেহ যদি স্বার্থপরতাশূন্য হয়, তবে তাহাই ঘটিতে পারে। কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের প্রকৃতি এইরূপ, যে স্বার্থপরতাশূন্য স্নেহ দুর্লভ। এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া, অনেকেই মনে মনে ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, যে মাতা স্নেহবশতঃ পুত্রকে অর্থান্বেষণে যাইতে দিল না—সে কি স্বার্থপর? বরং যদি স্বার্থপর হইত, তাহা হইলে পুত্রকে অর্থান্বেষণে দূরদেশে যাইতে নিষেধ করিত না, কেন না পুত্র অর্থোপার্জ্জন করিলে কোন্ না মাতা তাহার ভাগিনী হইবেন?—অতএব ঐরূপ দর্শন মাত্র আকাঙ্ক্ষী স্নেহকে অনেকেই অস্বার্থপর স্নেহ মনে করেন। বাস্তবিক সে কথা সত্য নহে—এ স্নেহ অস্বার্থপর নহে। যাঁহারা ইহা অস্বার্থপর মনে করেন, তাঁহারা অর্থপরতাকে স্বার্থপরতা মনে করেন; যে ধনের কামনা করে না তাহাকে স্বার্থপরতাশূন্য মনে করেন। ধনলাভ ভিন্ন পৃথিবীতে যে অন্যান্য সুখ আছে, এবং তন্মধ্যে কোন কোন্ সুখের আকাঙ্ক্ষা ধনাকাঙ্ক্ষা হইতে অধিকতর বেগবতী, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। যে মাতা অর্থের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, পুত্রমুখদর্শনসুখের বাসনায় পুত্রকে দারিদ্র্যে সমর্পণ করিল; সেও আত্মসুখ খুঁজিল। সে অর্থজনিত সুখ চায় না, কিন্তু পুত্রসন্দর্শনজনিত সুখ চায়। সে সুখ মাতার, পুত্রের নহে; মাতৃদর্শনজনিত পুত্রের যদি সুখ থাকে, থাক;—সে স্বতন্ত্র, পুত্রের প্রবৃত্তিদায়ক, মাতার নহে। মাতা এখানে আপনার একটি সুখ খুঁজিল—নিত্য পুত্রমুখদর্শন; তাহার অভিলাষিণী হইয়া পুত্রকে দারিদ্র্যদুঃখে দুঃখী করিতে চাহিল; এখানে, মাতা স্বার্থপর, কেন না আপনার সুখের অভিপ্রায়ে অন্যকে দুঃখী করিল।

মনুষ্যের স্নেহ অধিকাংশই এইরূপ প্রণয়ী প্রণয়ভাজন উভয়েরই চিত্তসুখকর, কিন্তু স্বার্থপর, পশুবৃত্ত। কেবল, প্রণয়ী অন্য সুখাপেক্ষা প্রণয়সুখের অভিলাষী এইজন্য লোকে এইরূপ স্নেহকে অস্বার্থপর বলে। কিন্তু স্নেহের যে সুখ, সে স্নেহযুক্তের; স্নেহযুক্ত আপন সুখের আকাঙ্ক্ষী বলিয়া, সাধারণ মনুষ্যস্নেহকে স্বার্থপর বৃত্তি বলিতেই হইবে।

কিন্তু স্বার্থসাধন জন্য, স্নেহ মনুষ্যহৃদয়ে স্থাপিত নহে। মানুষের যতগুলি বৃত্তি আছে, বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা এইটী পবিত্র ও মঙ্গলকর। মনুষ্যের চরিত্র এ পর্য্যন্ত তাদৃশ উৎকর্ষতা-লাভ করে নাই বলিয়াই মনুষ্যস্নেহ অদ্যাপি পশুবৎ। পশুবৎ, কেন না, পশুদিগেরও বৎসস্নেহ, দাম্পত্যপ্রণয় এবং বাৎসল্য দাম্পত্য ব্যতীত, পরস্পর অন্যবিধ প্রণয় আছে। প্রথমটী মানুষের অপেক্ষা অল্প পরিমাণে নহে।

স্নেহের যথার্থ স্বরূপই অস্বার্থপরতা। যে মাতা পুত্রের সুখের কামনায়, পুত্রমুখ দর্শন কামনা পরিত্যাগ করিলেন, তিনিই যথার্থ স্নেহবতী। যে, প্রণয়ী, প্রণয়ের পাত্রের মঙ্গলার্থ আপনার প্রণয়জনিত সুখভোগও ত্যাগ করিতে পারিল, সেই প্রণয়ী।

যত দিন না সাধারণ মনুষ্যের প্রেম, এইরূপ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইবে, ততদিন মানুষের ভালবাসা হইতে স্বার্থপরতা কলঙ্ক ঘুচিবে না। এবং স্নেহের যথার্থ স্ফূর্ত্তি ঘটিবে না। যেখানে ভালবাসা এইরূপ বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, বা যাহার হৃদয়ে হইয়াছে, সেইখানে ভালবাসার দ্বারায় ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। এরূপ বিশুদ্ধ প্রণয়বিশিষ্ট মনুষ্য দুর্লভ নহে। কিন্তু এ প্রবন্ধে তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি না—তাঁহারা অত্যাচারীও নহেন।

অন্যত্র, ধর্ম্মের শাসনে প্রণয় শাসিত করাই ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের একমাত্র উপায়। সে ধর্ম্ম কি?

ধর্ম্মের যিনি যে ব্যাখ্যা করুন না, ধর্ম্ম এক। দুইটিমাত্র মূলসূত্রে সমস্ত মনুষ্যের নীতিশাস্ত্র কথিত হইতে পারে। তাহার মধ্যে একটি আত্মসম্বন্ধীয়, দ্বিতীয়টি পরসম্বন্ধীয়। যাহা আত্মসম্বন্ধীয়, তাহাকে আত্মসংস্কারনীতির মূল বলা যাইতে পারে,—এবং আত্মচিত্তের স্ফূর্ত্তি এবং নির্ম্মলতা রক্ষাই তাহার উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়টি, পরসম্বন্ধীয় বলিয়াই তাহাকে যথার্থ ধর্ম্মনীতির মূল বলা যাইতে পারে। "পরের অনিষ্ট করিও না; সাধ্যানুসারে পরের মঙ্গল করিও।" এই মহতী উক্তি জগতীয় তাবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রের একমাত্র মূল, এবং একমাত্র পরিণাম। অন্য যে কোন নৈতিক উক্তি বল না কেন, তাহার আদি ও চরম ইহাতেই বিলীন হইবে। আত্মসংস্কারনীতির সকল তত্ত্বের সহিত, এই মহানীতিতত্ত্বের ঐক্য আছে। এবং পরহিত নীতি এবং আত্মসংস্কারনীতি একই তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা মাত্র। পরহিতরতি এবং পরের অহিতে বিরতি, ইহাই সমগ্র নীতিশাস্ত্রের সার উপদেশ।

অতএব এই ধর্ম্মনীতির মূল সূত্রাবলম্বন করিলেই, ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ হইবে। যখন স্নেহশালী ব্যক্তি স্নেহের পাত্রের কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হয়েন, তখন, তাঁহার মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করা উচিত, যে আমি কেবল আপন সুখের জন্য, হস্তক্ষেপ করিব না; আপনার ভাবিয়া, যাহার প্রতি স্নেহ করি, তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট করিব না। আমার যতটুকু কষ্ট সহ্য করিতে হয়, করিব; তথাপি তাহার কোন প্রকার অহিতে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব না।

এ কথা শুনিতে অতি ক্ষুদ্র, এবং পুরাতন জনশ্রুতির

পুনরুক্তি বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহার প্রয়োগ সকল সময়ে তত সহজ বোধ হইবে না। উদাহরণ স্বরূপ, দশরথ-কৃত রামনির্ব্বাসন, মীমাংসার্থ গ্রহণ করিব; তদ্দ্বারা এই সামান্য নিয়মের প্রয়োগের কঠিনতা অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। এস্থলে কৈকেয়ী এবং দশরথ উভয়েই ভালবাসার অত্যাচারে প্রবৃত্ত; কৈকেয়ী দশরথের উপরে; দশরথ রামের উপরে। ইহার মধ্যে কৈকেয়ীর কার্য্য স্বার্থপর এবং নৃশংস বলিয়া চিরপরিচিত। কৈকেয়ীর কার্য্য স্বার্থপর ও নৃশংস বটে, তবে তৎপ্রতি যতটা কটূক্তি হইয়া আসিতেছে ততটা বিহিত কি না বলা যায় না। কৈকেয়ী আপনার কোন ইষ্ট কামনা করে নাই; আপনার পুত্রের শুভ কামনা করিয়াছিল। সত্য বটে পুত্রের মঙ্গলেই মাতার মঙ্গল; কিন্তু যে বঙ্গীয় পিতা মাতা, স্বীয় জাতিপাতের ভয়ে পুত্রকে শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে যাইতে দেন না, কৈকেয়ীর কার্য্য তদপেক্ষা যে শতগুণে অস্বার্থপর, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

সে কথা যাউক, কৈকেয়ীর দোষ গুণ বিচারে আমরা প্রবৃত্ত নহি। দশরথ, সত্যপালনার্থ রামকে বনপ্রেরণ করিয়া ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। তাহাতে তাঁহার নিজের প্রাণবিয়োগ হইল। তিনি সত্যপালনার্থ আত্মপ্রাণবিয়োগ এবং প্রাণাধিক পুত্রের বিরহ স্বীকার করিলেন, ইহাতে ভারতবর্ষীয় সাহিত্যেতিহাস তাঁহার যশকীর্ত্তন পরিপূর্ণ। কিন্তু উৎকৃষ্ট ধর্ম্মনীতির বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, যে দশরথ পুত্রকে স্বাধিকারচ্যুত এবং নির্ব্বাসিত করিয়া, সত্যপালন করায়, ঘোরতর অধর্ম্ম করিয়াছিলেন।

জিজ্ঞাসা করি, সত্য মাত্র কি পালনীয়? যদি সতী কুলবতী, কুচরিত্র পুরুষের কাছে ধর্ম্মত্যাগে প্রতিশ্রুতা হয়, তবে সে

সত্য কি পালনীয়? যদি কেহ, দস্যুর প্ররোচনায় সুহৃদ্‌কে বিনাদোষে বধ করিতে সত্য করে, তবে সে সত্য কি পালনীয়? যে কেহ ঘোরতর মহাপাতক করিতে সত্য করে, তাহার সত্য কি পালনীয়?

যেখানে সত্য লঙ্ঘনাপেক্ষা সত্য রক্ষায় অধিক অনিষ্ট, সেখানে সত্য রাখিবে, না সত্য ভঙ্গ করিবে? অনেকে বলিবেন, সেখানেও সত্য পালনীয়, কেন না, সত্য নিত্যধর্ম্ম, অবস্থাভেদে তাহা পুণ্যত্ব পাপত্ব প্রাপ্ত হয় না। যদি পাপ পুণ্যের এমন নিয়ম কর, যে যখন যাহা কর্ম্মকর্ত্তার বিবেচনায় ইষ্টকারক তাহাই কর্ত্তব্য; যাহা তাঁহার তাৎকালিক বিবেচনায় অনিষ্টকারক তাহা অকর্ত্তব্য, তবে পুণ্য পাপের প্রভেদ থাকে না—লোকে পুণ্য বলিয়া ঘোরতর মহাপাতকে প্রবৃত্ত হইতে পারে। আমরা এ তত্ত্বের মীমাংসা এ স্থলে করিব না—কেন না হিতবাদীরা ইহার এক প্রকার মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন। স্থূল কথার উত্তর দিব।

যখন এরূপ মীমাংসার গোলযোগ হইবে, তখন ধর্ম্মনীতির যে মূল সূত্র সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা পরীক্ষা কর।

সত্য কি সর্ব্বত্র পালনীয়? এ কথার মীমাংসা করিবার আগে জিজ্ঞাস্য, সত্য পালনীয় কেন? সত্য পালনের একটি মূল ধর্ম্মনীতিতে, একটি মূল আত্ম সংস্কারনীতিতে। আমরা আত্ম সংস্কার নীতিকে ধর্ম্মনীতির অংশ বলিয়া পরিগণিত করিতে অস্বীকার করিয়াছি; ধর্ম্মনীতির মূলই দেখিব। বিশেষ উভয়ের ফল একই। ধর্ম্মনীতির মূল সূত্র, পরের অনিষ্ট যাহাতে হয়, তাহা অকর্ত্তব্য। সত্য ভঙ্গে পরের অনিষ্ট হয়, এজন্য সত্য পালনীয়। কিন্তু যখন এমন ঘটে, যে সত্য পালনে পরের গুরুতর অনিষ্ট, সত্য ভঙ্গে ততদূর নহে, তখন সত্য পালনীয়

নহে। দশরথের সত্যপালনে রামের গুরুতর অনিষ্ট; সত্য ভঙ্গে কৈকেয়ীর তাদৃশ কোন অনিষ্ট নাই। দৃষ্টান্তজনিত জন-সমাজের যে অনিষ্ট, তাহা রামের স্বাধিকারচ্যুতিতেই গুরুতর। উহা দস্যুতার রূপান্তর। অতএব এমত স্থলে দশরথ সত্যপালন করিয়াই মহাপাপ করিয়াছিলেন।

এখানে দশরথ স্বার্থপরতাশূন্য নহেন। সত্য ভঙ্গে জগতে তাঁহার কলঙ্ক ঘোষিত হইবে, এই ভয়েই তিনি রামকে অধিকার-চ্যুত এবং বহিষ্কৃত করিলেন; অতএব যশোরক্ষা রূপ স্বার্থের বশীভূত হইয়া রামের অনিষ্ট করিলেন। সত্য বটে, তিনি আপনার প্রাণহানিও স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার কাছে প্রাণাপেক্ষা যশ প্রিয়, অতএব আপনার ইষ্টই খুঁজিয়াছিলেন। এজন্য তিনি স্বার্থপর। স্বার্থপরতা দোষযুক্ত যে অনিষ্ট তাহা ঘোরতর পাপ।

অস্বার্থপর প্রেম, এবং ধর্ম্ম, ইহাদের একই গতি একই চরম। উভয়ের সাধ্য অন্যের মঙ্গল। বস্তুতঃ প্রেম, এবং ধর্ম্ম একই পদার্থ। সর্ব্ব সংসার প্রেমের বিষয়ীভূত হইলেই ধর্ম্ম নাম প্রাপ্ত হয়। এবং ধর্ম্ম যত দিন না সর্ব্বজনীন প্রেম স্বরূপ হয়, ততদিন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু মনুষ্যগণ, কার্য্যতঃ স্নেহকে ধর্ম্ম হইতে পৃথগ্‌ভূত রাখিয়াছে, এজন্য ভাল-বাসার অত্যাচার নিবারণ জন্য ধর্ম্মের দ্বারা স্নেহের শাসন আবশ্যক।



জ্ঞান।

ভারতবর্ষে দর্শন কাহাকে বলে? ইহার উত্তর দিতে গেলে প্রথমে বুঝিতে হইবে, যে ইউরোপে যে অর্থে "ফিলোসফি" শব্দ ব্যবহৃত হয়, দর্শন সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বাস্তবিক ফিলসফি শব্দের অর্থের স্থিরতা নাই,—কখন ইহার অর্থ অধ্যাত্মতত্ত্ব, কখন ইহার অর্থ প্রাকৃতিকবিজ্ঞান, কখন ইহার অর্থ ধর্ম্মনীতি, কখন ইহার অর্থ বিচারবিদ্যা। ইহার একটিও দর্শনের ব্যাখ্যার অনুরূপ নহে। ফিলসফির উদ্দেশ্য, জ্ঞান বিশেষ; তদতিরিক্ত অন্য উদ্দেশ্য নাই। দর্শনেরও উদ্দেশ্য জ্ঞান বটে, কিন্তু সে জ্ঞানেরও উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য, নিঃশ্রেয়স, মুক্তি, নির্ব্বাণ বা তদ্বৎ নামান্তর বিশিষ্ট পারলৌকিক অবস্থা। ইউরোপীয় ফিলসফিতে জ্ঞানই সাধনীয়; দর্শনে জ্ঞান সাধন মাত্র। ইহাভিন্ন আর একটি গুরুতর প্রভেদ আছে। ফিলসফির উদ্দেশ্য, জ্ঞানবিশেষ,—কখন আধ্যাত্মিক, কখন ভৌতিক, কখন নৈতিক বা সামাজিক জ্ঞান। কিন্তু সর্ব্বত্র পদার্থ মাত্রেরই জ্ঞান দর্শনের উদ্দেশ্য। ফলতঃ সকল প্রকার জ্ঞানই দশনের অন্তর্গত।

জ্ঞানে নিঃশ্রেয়স লাভ, ইহা ইউরোপীয় দিগের পক্ষে নূতন কথা বটে, এবং এদেশে প্রচলিত "ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর" ইত্যাদি প্রবাদের বিপরীত। জ্ঞানবাদীদিগের বিরোধী ভক্তিবাদীও যে এদেশে ছিলেন না, এমত নহে। প্রধান ভক্তি সূত্রকার শাণ্ডিল্য এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতা চৈতন্য দেব।

সংসার দুঃখময়। প্রাকৃতিক বল, সর্ব্বদা মনুষ্য সুখের প্রতিদ্বন্দ্বী। তুমি যাহা কিছু সুখভোগ কর, সে বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে

যুদ্ধ করিয়া লাভ কর। মনুষ্যজীবন, প্রকৃতির সঙ্গে দীর্ঘ সমর মাত্র—যখন তুমি সমরজয়ী হইলে তখনই কিঞ্চিৎ সুখলাভ করিলে। কিন্তু মনুষ্যবল হইতে প্রাকৃতিক বল অনেক গুণে গুরুতর। অতএব মনুষ্যের জয় কদাচিৎ—প্রকৃতির জয়ই প্রতিনিয়ত ঘটিয়া থাকে। তবে জীবন যন্ত্রণাময়। আর্য্য মতে ইহার আবার পৌনঃপুন্য আছে। ইহজন্মে, অনন্তদুঃখ কোনরূপে কাটাইয়া প্রাকৃতিক রণে শেষে পরাস্ত হইয়া, যদি জীব দেহত্যাগ করিল—তথাপি ক্ষমা নাই—আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, আবার সেই অনন্ত দুঃখভোগ করিতে হইবে—আবার মরিতে হইবে, আবার জন্মিতে হইবে—আবার দুঃখ। এই অনন্ত দুঃখের কি নিবৃত্তি নাই? মনুষ্যের নিস্তার নাই?

ইহার দুই উত্তর আছে। এক উত্তর ইউরোপীয়, আর এক উত্তর ভারতবর্ষীয়। ইউরোপীয়েরা বলেন, প্রকৃতি জেয়; যাহাতে প্রকৃতিকে জয় করিতে পার সেই চেষ্টা দেখ। এই জীবন রণে প্রকৃতিকে পরাস্ত করিবার জন্য আয়ুধ সংগ্রহ কর। সেই আয়ুধ, প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজেই বলিয়া দিবেন। প্রাকৃতিক তত্ত্ব অধ্যয়ন কর—প্রকৃতির গুপ্ত তত্ত্ব সকল অবগত হইয়া, তাহারই বলে তাহাকে বিজিত করিয়া, মনুষ্যজীবন সুখময় কর। এই উত্তরের ফল—ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্র।

ভারতবর্ষীয় উত্তর এই, যে প্রকৃতি অজেয়—যতদিন প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিবে ততদিন দুঃখ থাকিবে। অতএব প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদই দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায়। সেই সম্বন্ধবিচ্ছেদ কেবল জ্ঞানের দ্বারাই হইতে পারে। এই উত্তরের ফল ভারতবর্ষীয় দর্শন।

সেই জ্ঞান কি? আকাশ কুসুম বলিলেও একটি জ্ঞান হয়—

কেন না আকাশ কি তাহা আমরা জানি, এবং কুসুম কি তাহাও জানি, মনের শক্তির দ্বারা উভয়ে সংযোগ করিতে পারি। কিন্তু সে জ্ঞান, দর্শনের উদ্দেশ্য নহে। তাহা ভ্রমজ্ঞান। যথার্থ জ্ঞানই দর্শনের উদ্দেশ্য। এই যথার্থ জ্ঞানকে প্রমাজ্ঞান বা প্রমা প্রতীতি বলে। সেই যথার্থ জ্ঞান কি?

যাহা জানি, তাহাই জ্ঞান। যাহা জানি তাহা কি প্রকারে জানিয়াছি?

কতকগুলি বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে পারি। ঐ গৃহ, এই বৃক্ষ, ঐ নদী, এই পর্ব্বত, আমার সম্মুখে রহিয়াছে; তাহা আমি চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, এজন্য জানি যে ঐ গৃহ, এই বৃক্ষ, ঐ নদী, এই পর্ব্বত আছে। অতএব জ্ঞাতব্য পদার্থের সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগে আমাদিগের এই জ্ঞান লব্ধ হইল। (১) ইহাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বলে। এইরূপ, গৃহমধ্যে থাকিয়া শুনিতে পাইলাম, মেঘ গর্জ্জিতেছে, পক্ষী ডাকিতেছে; এখানে মেঘের ডাক, পক্ষীর রব আমরা কর্ণের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহা শ্রাবণ প্রত্যক্ষ। এইরূপ চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, ত্বাচ, এবং রাসন, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাধ্য পাঁচ প্রত্যক্ষ। মনও একটি ইন্দ্রিয় বলিয়া আর্য্য দার্শনিকেরা গণিয়া থাকেন, অতএব তাঁহারা মানস প্রত্যক্ষের কথা বলেন। মন বহিরিন্দ্রিয় নহে। অন্তরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে বহির্ব্বিষয়ের সাক্ষাৎসংযোগ অসম্ভব। অতএব মানস প্রত্যক্ষে বহির্ব্বিষয় অবগত হওয়া যায়না; কিন্তু অন্তর্ব্বিষয় জ্ঞান, মানস প্রত্যক্ষের দ্বারাই হইবে।

(১) গৃহ, পর্ব্বতাদি দূরে রহিয়াছে—আমাদিগের চক্ষে সংলগ্ন নহে, তবে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইল কি প্রকারে? দৃষ্ট পদার্থ বিক্ষিপ্ত রশ্মির দ্বারা। ঐ রশ্মি আমাদিগের নয়নাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দৃষ্টি হয়।

যে পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, তদ্বিষয়ে আমাদিগের জ্ঞান জন্মে, এবং তদ্ব্যতিরিক্ত বিষয়ের জ্ঞানও সূচিত হয়। আমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া আছি, এমত সময়ে মেঘের ধ্বনি শুনিলাম, ইহাতে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল। কিন্তু সে প্রত্যক্ষ ধ্বনির, মেঘের নহে। মেঘ এখানে আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। অথচ আমরা জানিতে পারিলাম যে আকাশে মেঘ আছে। ধ্বনির প্রত্যক্ষে মেঘের অস্তিত্ব জ্ঞান হইল কোথা হইতে? আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেখিয়াছি, আকাশে মেঘ ব্যতীত কখন ঐরূপ ধ্বনি হয় নাই। এমন কখনও ঘটে নাই যে, মেঘ নাই, অথচ ঐরূপ ধ্বনি শুনা গিয়াছে। অতএব রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে থাকিয়াও আমরা বিনাপ্রত্যক্ষে জানিলাম যে আকাশে মেঘ হইয়াছে। ইহাকে অনুমিতি বলে। মেঘধ্বনি, আমরা প্রত্যক্ষে জানিয়াছি, কিন্তু মেঘ অনুমিতির দ্বারা।

মনে কর,ঐ রুদ্ধদ্বার গৃহ অন্ধকার,এবং তুমি সেখানে একাকী আছ। এমত কালে তোমার দেহের সহিত মনুষ্যশরীরের স্পর্শ অনুভূত করিলে। তুমি তখন কিছু না দেখিয়া, কোন শব্দও না শুনিয়া জানিতে পারিলে যে গৃহমধ্যে মনুষ্য আসিয়াছে। সেই স্পর্শজ্ঞান, ত্বাচ প্রত্যক্ষ; কিন্তু গৃহমধ্যে মনুষ্যজ্ঞান অনুমিতি। ঐ অন্ধকারগৃহে তুমি যদি যূথিকা পুষ্পের গন্ধ পাও, তবে তুমি বুঝিবে, যে গৃহে যূথিকা পুষ্প আছে; এখানে গন্ধই প্রত্যক্ষের বিষয়; পুষ্প অনুমিতির বিষয়।

মনুষ্য অল্প বিষয়ই স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারে। অধিকাংশই অনুমিতির উপর নির্ভর করে। অনুমিতি সংসার চালাইতেছে। আমাদিগের অনুমানশক্তি না থাকিলে, আমরা প্রায় কোন কার্য্যই করিতে পারিতাম না। বিজ্ঞান, দর্শনাদি, অনুমানের উপরেই নির্ম্মিত।

কিন্তু যেমন কোন মনুষ্যই সকল বিষয় স্বয়ংপ্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, তেমনি কোন ব্যক্তি সকলতত্ত্ব স্বয়ং অনুমান করিয়া সিদ্ধ করিতে পারেন না। এমন অনেক বিষয় আছে, যে তাহা অনুমান করিয়া জানিতে গেলে যে পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা একজন মনুষ্যের জীবনকালের মধ্যে সাধ্য নহে। এমন অনেক বিষয় আছে যে তাহা অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করার জন্য যে বিদ্যা, বা যে জ্ঞান, বা যে বুদ্ধি, বা যে অধ্যবসায় প্রয়োজনীয় তাহা অধিকাংশ লোকের নাই। অতএব এমন অনেক নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আছে, যে তাহা অনেকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারেন না। এমন স্থলে আমরা কি করিয়া থাকি? যে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছে, বা যে স্বয়ং অনুমান করিয়াছে, তাহার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করি। ইতালীর উত্তরে যে আল্প নামে পর্ব্বতশ্রেণী আছে তাহা তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর নাই। কিন্তু যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের প্রণীত পুস্তক পাঠ করিয়া তুমি সে জ্ঞান লাভ করিলে। পরমাণু মাত্র যে অন্য পরমাণু মাত্রের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, ইহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না, এবং তুমিও ইহা গণনার দ্বারা সিদ্ধ করিতে পার নাই, এজন্য তুমি নিউটনের কথায় বিশ্বাস করিয়া সে জ্ঞান লাভ করিলে।

ন্যায়, সাংখ্যাদি আর্য্যদর্শনশাস্ত্রে ইহা একটি তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহার নাম শব্দ। তাঁহাদিগের বিবেচনায় বেদাদি এই প্রমাণের উপর নির্ভর করে। আপ্তবাক্য বা গুরূপদেশ, স্থূলতঃ যে বিশ্বাসযোগ্য তাহার উপদেশ,—আর্য্যমতে ইহা একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। তাহারই নাম শব্দ।

কিন্তু চার্ব্বাগাদি কোন কোন আর্য্য দার্শনিক, ইহাকে

প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করেন না। ইউরোপীয়েরাও, ইহাকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না।

দেখা যাইতেছে, সকলের কথাতে বিশ্বাস অকর্ত্তব্য। যদি একজন বিখ্যাত মিথ্যাবাদী আসিয়া বলে যে, সে জলে অগ্নি জ্বলিতে দেখিয়া আসিয়াছে তবে এ কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। তাহার উপদেশে প্রমাজ্ঞানের উৎপত্তি নাই। ব্যক্তি-বিশেষের উপদেশই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। তবে, সেই জ্ঞান-লাভের পূর্ব্বে, আদৌ মীমাংসা আবশ্যক যে কে বিশ্বাসযোগ্য কে নহে। কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ মীমাংসা করিব? কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, মন্বাদির কথা আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিব, এবং রামু শ্যামুর কথা অগ্রাহ্য করিব? দেখা যাইতেছে, যে অনুমানের দ্বারা ইহা সিদ্ধ করিতে হইবে। মনুর সঙ্গে পল্লীর পাদরি সাহেবের মতভেদ। তুমি চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছ, যে মনু অভ্রান্ত ঋষি, এবং পাদরি সাহেব স্বার্থপর সামান্য মনুষ্য; এজন্য তুমি অনুমান করিলে যে মনুর কথা গ্রাহ্য, পাদরির কথা অগ্রাহ্য। মনুর ন্যায় অভ্রান্ত ঋষি গোমাংসভোজন নিষেধ করিয়াছেন, বলিয়া তুমি অনুমান করিলে গোমাংস অভক্ষ্য। অতএব শব্দকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ না বলিয়া, অনুমানের অন্তর্গত বল না কেন?

শুধু তাহাই নহে। যে ব্যক্তির কতক গুলি উপদেশ গ্রাহ্য করি, তাহারই আর কতকগুলি অগ্রাহ্য করিয়া থাক। মাধ্যা-কর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা তুমি শিরোধার্য্য কর, কিন্তু আলোক সম্বন্ধে তাঁহার যে মত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তুমি ক্ষুদ্রতর বুদ্ধিজীবী ইয়ঙ ও ফ্রেনেলের মত গ্রহণ কর, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ সন্ধান করিলে, তলে অনুমিতি-কেই পাওয়া যাইবে। অনুমানের দ্বারা তুমি জানিয়াছ যে

মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা সত্য, আলোক সম্বন্ধে তাঁহার যে মত তাহা অসত্য। যদি শব্দ একটী পৃথক্ প্রমাণ হইত, তবে তাঁহার সকল মতই তুমি গ্রাহ্য করিতে।

ভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়া থাকে। ভারতবর্ষে যাহার মত গ্রাহ্য বলিয়া স্থির হয়, তাহার সকল মতই গ্রাহ্য হয়। ইহার কারণ শব্দ একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য—আপ্তবাক্য মাত্র গ্রাহ্য, ইহা আর্য্য দর্শনশাস্ত্রের আজ্ঞা। এইরূপ বিশেষ বিচার ব্যতীত ঋষি ও পণ্ডিত দিগের মতমাত্রই গ্রহণ করা, ভারতবর্ষের অবনতির একটি যে কারণ ইহা বলা বাহুল্য। অতএব দার্শনিকদিগের এই একটি ক্ষুদ্র ভ্রান্তিতে সামান্য কুফল ফলে নাই।

প্রত্যক্ষ,অনুমান এবং শব্দ ভিন্ন নৈয়ায়িকেরা উপমিতিকেও একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বিবেচনা করেন। বিচার করিয়া দেখিলে সিদ্ধ হইবে যে উপমিতি, অনুমিতির প্রকারভেদ মাত্র, এবং সেই জন্য সাংখ্যাদি দর্শনে উপমিতি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় নাই। অতএব উপমিতির বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজনীয় বোধ হইল না। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ, এবং অনুমাই জ্ঞানের মূল।

তাহার পর দেখিতে হইবে, যে অনুমানও প্রত্যক্ষমূলক। যে জাতীয় প্রত্যক্ষ কখন হয় নাই, সে বিষয়ে অনুমান হয় না। তুমি যদি কখন পূর্ব্বে মেঘ না দেখিতে, বা আর কেহ কখন না দেখিত, তবে তুমি রুদ্ধদ্বার গৃহমধ্যে মেঘগর্জ্জন শুনিয়া কখন মেঘানুমান করিতে পারিতে না। তুমি যদি কখন যূথিকা গন্ধ প্রত্যক্ষ না করিতে, তবে অন্ধকারগৃহে থাকিয়া যূথিকা ঘ্রাণ পাইয়া তুমি কখন অনুমান করিতে পারিতে না, যে গৃহমধ্যে যূথিকা আছে। এইরূপ অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধে বলা যাইতে

পারে। তবে অনেক সময়ে দেখা যাইবে, যে একটি অনুমানের মূল, বহুতর বহুজাতীয় পূর্ব্বপ্রত্যক্ষ। এক একটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম সহস্র সহস্র জাতীয় প্রত্যক্ষের ফল।

অতএব প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল—সকল প্রমাণের মূল। অনেকে দেখিয়া বিস্মিত হইবেন, যে দর্শনশাস্ত্র, দুই তিন সহস্র বৎসরের পর, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার সেই চার্ব্বাকের মতে আসিয়া পড়িতেছে। ধন্য আর্য্যবুদ্ধি! যাহা এতকালে হূম, মিল, বেন প্রভৃতির দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে— দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে বৃহস্পতি তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। কেহ না ভাবেন যে আমরা এমন বলিতেছি যে প্রত্যক্ষভিন্ন প্রমাণ নাই—আমরা বলিতেছি যে, সকল প্রমাণের মূল প্রত্যক্ষ। বৃহস্পতি ঠিক তাহাই বলিয়াছিলেন কি না, তাঁহার গ্রন্থ সকল লুপ্ত হওয়ায় নিশ্চয় করা কঠিন।

প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল, কিন্তু এই তত্ত্বের মধ্যে ইউরোপীয় দার্শনিক দিগের মধ্যে একটী ঘোরতর বিবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন, যে আমাদিগের এমন অনেক জ্ঞান আছে, যে তাহার মূল প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় না। যথা, কাল, আকাশ, ইত্যাদি।

কথাটি বুঝা কঠিন। আকাশ সম্বন্ধে একটি সহজ কথা গ্রহণ করা যাউক,—যথা, দুইটি সমানান্তরাল রেখা যতদূর টানা যাউক, কখন মিলিত হইবে না, ইহা আমরা নিশ্চিত জানি। কিন্তু এ জ্ঞান আমরা কোথা পাইলাম? প্রত্যক্ষবাদী বলিবেন "প্রত্যক্ষের দ্বারা। আমরা যত সমানান্তরাল রেখা দেখিয়াছি, তাহা কখন মিলিত হয় নাই।" তাহাতে বিপক্ষেরা প্রত্যুত্তর করেন, যে "জগতে যত সমানান্তরাল রেখা হইয়াছে, সকল তুমি দেখ নাই—তুমি যাহা দেখিয়াছ, তাহা মিলে নাই বটে,

কিন্তু তুমি কি প্রকারে জানিলে যে কোন কালে কোথায় এমন দুইটি সমানান্তরাল রেখা হয় নাই, বা হইবে না, যে তাহা টানিতে টানিতে একস্থানে মিলিবে না? যাহা মনুষ্যের প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহা হইতে তুমি কি প্রকারে অপ্রত্যক্ষীভূতের নিশ্চয় করিলে? অথচ আমরা জানিতেছি যে তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য;--কস্মিন্ কালে কোথাও এমত দুইটি সমানান্তরাল রেখা হইতে পারে না যে তাহা মিলিবে। তবে প্রত্যক্ষ ব্যতীত তোমার আর কোন জ্ঞানমূল আছে—নহিলে তুমি এই প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত জ্ঞানটুকু কোথায় পাইলে?"

এই কথা বলিয়া, বিখ্যাত জর্ম্মান দার্শনিক কান্ত, লক ও হ্যুমের প্রত্যক্ষবাদের প্রতিবাদ করেন। এই অতিরিক্ত জ্ঞানের মূল তিনি এই নির্দ্দেশ করেন, যে যেখানে বহির্ব্বিষয়ের জ্ঞান আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হইয়া থাকে, সেখানে বহির্ব্বিষয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন তত্ত্বের নিত্যত্ব আমাদের জ্ঞানের অতীত হইলেও, আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতির নিত্যত্ব আমাদিগের জ্ঞানের আয়ত্ত বটে। আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রকৃতি অনুসারে আমরা বহির্ব্বিষয় কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অবস্থাপন্ন বলিয়া পরিজ্ঞাত হই। ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি সর্ব্বত্র একরূপ, এজন্য বহির্ব্বিষয়ের তত্তৎ অবস্থাও আমাদিগের নিকট সর্ব্বত্র একরূপ। এইজন্য আমাদিগের কাল, আকাশাদির সমবায়ের নিত্যত্ব জানিতে পারি। এই জ্ঞান আমাদিগেতেই আছে—এজন্য কান্ত ইহাকে স্বতোলব্ধ বা আভ্যন্তরিক জ্ঞান বলেন। আমাদিগের ব্রাহ্মেরা ইহাকে সহজজ্ঞান বলেন।

পাঠক আবার দেখিবেন যে আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন, ফিরিয়া ফিরিয়া সেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে মিলিতেছে। যেমন চার্ব্বাকের প্রত্যক্ষবাদে, মিল ও বেনের প্রত্যক্ষবাদের

সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে, তেমনি বেদান্তের মায়াবাদের সঙ্গে কান্তের এই প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। আধ্যাত্মিক তত্ত্বে, প্রাচীন আর্য্যগণ কর্ত্তৃক সূচিত হয় নাই, এমত তত্ত্ব অল্পই ইউরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কান্তীয় আভ্যন্তরিক মতের প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী জন ষ্টুয়ার্ট মিল। তিনি কার্য্যকারণসম্বন্ধের নিত্যত্বের উপর নির্ভর করেন। তিনি বলেন যে আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা একটী অকাট্য সংস্কার এই লাভ করিয়াছি, যে যেখানে কারণ বর্ত্তমান আছে সেই খানেই তাহার কার্য্য বর্ত্তমান থাকিবে। যেখানে পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ক বর্ত্তমান আছে, সেইখানে দেখিয়াছি যে খ আছে। পুনর্ব্বার যদি কোথাও ক দেখি, তবে আমরা জানিতে পারি যে খও এখানে আছে, কেন না আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা জানিয়াছি যেখানে কারণ থাকে সেইখানেই তাহার কার্য্য থাকে। সমানান্তরালতা কারণ, এবং সংমিলনবিরহ তাহার কার্য্য, কেন না আমরা যেখানে যেখানে সমানান্তরালতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেইখানে সেই খানে দেখিয়াছি মিল হয় নাই, অতএব সমানান্তরালতা, সংমিলনবিরহের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী। কাজেই আমরা জানিতেছি যে যখন যেখানে দুইটী সমানান্তরাল রেখা থাকিবে, সেই খানেই আর তাহাদিগের মিলন হইবে না। অতএব এ জ্ঞানও প্রত্যক্ষমূলক।

শেষ মত, হর্বর্টস্পেন্সরের। তিনিও প্রত্যক্ষবাদী, কিন্তু তিনি বলেন যে এই প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞান সকলটুকু আমাদিগের নিজ প্রত্যক্ষজাত নহে। প্রত্যক্ষজাত সংস্কার পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের যে প্রত্যক্ষজাত সংস্কার, আমি তাহা কিয়দংশে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি যে সেই সকল সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছি এমত নহে—তাহা হইলে

সদ্যঃপ্রসূত শিশুও সংস্কারবিশিষ্ট হইত, কিন্তু তাহার বীজ আমার শরীরে (মন, শরীরের অন্তর্গত) আছে; প্রয়োজনমত সময়ে জ্ঞানে পরিণত হইবে। এইরূপে, যাঁহা কান্তীয় মতে আভ্যন্তরিক বা সহজ জ্ঞান, স্পেন্সরের মতে তাহা পূর্ব্বপুরুষ-পরম্পরাগত প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান।

এই কথা আপাততঃ অপ্রামাণিক বোধ হইতে পারে, কিন্তু স্পেন্সর এরূপ দক্ষতার সহিত ইহার সমর্থন করিয়াছেন, যে ইউরোপে এই মতই এক্ষণে প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। (২)



সাংখ্যদর্শন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপক্রমণিকা।

এ দেশীয় প্রাচীন দর্শন সকলের মধ্যে বঙ্গদেশে ন্যায়ের প্রাধান্য। দেশীয় পণ্ডিতেরা সচরাচর সংখ্যের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ করেন না। কিন্তু ভারতবর্ষে সাংখ্য যে কীর্ত্তি করিয়াছে, তাহা অন্য দর্শন দূরে থাকুক, অন্য কোন শাস্ত্রের দ্বারা হইয়াছে কি না, সন্দেহ। বহুকাল হইল, এই দর্শনের

(২) অনেকে কোমতের "Positive Philosophy" নামক দর্শনশাস্ত্রের নামানুবাদে প্রত্যক্ষবাদ লিখিয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় সেটী ভ্রম। যাহাকে "Empirical Philosiphy" বলে অর্থাৎ লক, হুম, মিল, ওবেনের মতকেই প্রত্যক্ষবাদ বলা যায়। আমরা সেই অর্থেই প্রত্যক্ষবাদ শব্দ এই প্রবন্ধে ব্যবহার করিয়াছি।

প্রকাশ হয়। কিন্তু অদ্যাপি হিন্দুসমাজের হৃদয়মধ্যে ইহার নানা মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। যিনি হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিতে চাহেন, সাংখ্যদর্শন না বুঝিলে তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান জন্মিবে না; কেন না হিন্দুসমাজের পূর্ব্বকালীন গতি অনেক দূর সাংখ্যপ্রদর্শিত পথে হইয়াছিল। যিনি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের চরিত্র বুঝিতে চাহেন, তিনি সাংখ্য অধ্যয়ন করুন। সেই চরিত্রের মূল সাংখ্যে অনেক দেখিতে পাইবেন। সংসার যে দুঃখময়, দুঃখ নিবারণমাত্র আমাদিগের পুরুষার্থ, এ কথা যেমন হিন্দুজাতির হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, এমন, বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে হয় নাই। তাহার বীজ সাংখ্যদর্শনে। তন্নিবন্ধন,ভারতবর্ষে যে পরিমাণে বৈরাগ্য বহুকাল হইতে প্রবল, তেমন আর কোন দেশেই নহে। সেই বৈরাগ্যপ্রাবল্যের ফল বর্ত্তমান হিন্দুচরিত্র। যে কার্য্যপরতন্ত্রতার অভাব আমাদিগের প্রধান লক্ষণ বলিয়া বিদেশীয়েরা নির্দ্দেশ করেন, তাহা সেই বৈরাগ্যের সাধারণতা মাত্র। যে অদৃষ্টবাদিত্ব আমাদিগের দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ, তাহা সাংখ্যজাত বৈরাগ্যের ভিন্নমূর্ত্তি মাত্র। এই বৈরাগ্যসাধারণতা এবং অদৃষ্টবাদিত্বের কৃপাতেই ভারতবর্ষীয়দিগের অসীম বাহুবল সত্ত্বেও আর্য্যভূমি মুসলমানপদানত হইয়াছিল। সেই জন্য অদ্যাপি ভারতবর্ষ পরাধীন। সেই জন্যই বহুকাল হইতে এ দেশে সমাজোন্নতি মন্দ হইয়া, শেষে অবরুদ্ধ হইয়াছিল।

আবার সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ লইয়া তন্ত্রের সৃষ্টি। সেই তান্ত্রিককাণ্ডে দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই তন্ত্রের কৃপায় বিক্রমপুরে বসিয়া নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঠাকুর অপরিমিত মদিরা উদরস্থ করিয়া, ধর্ম্মাচরণ করিলাম বলিয়া, পরম পরিতোষ লাভ করিতেছেন। সেই তন্ত্রের প্রভাবে, প্রায় শত যোজন দূরে, ভারতবর্ষের

পশ্চিমাংশে কাণফোঁড়া যোগী উলঙ্গ হইয়া কদর্য্য উৎসব করিতেছে। সেই তন্ত্রের প্রসাদে আমরা দুর্গোৎসব করিয়া এই বাঙ্গালা দেশের ছয় কোটি লোক জীবন সার্থক করিতেছি। যখন গ্রামে গ্রামে, নগরে মাঠে জঙ্গলে শিবালয়, কালীর মন্দির দেখি, আমাদের সাংখ্য মনে পড়ে; যখন দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী পূজার বাদ্য শুনি, আমাদের সাংখ্যদর্শন মনে পড়ে।

অদ্যাপি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সুশিক্ষিত প্রাচীন হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মপুস্তক। সেই গীতা মিশ্র পদার্থ। তৎপ্রণেতা যিনিই হউন, "বহুশাস্ত্র গুরূপাসনোপি সারাদানং ষট্‌পদবৎ"* সাংখ্য প্রবচনের এই বাক্যানুসারে তিনি কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য যেখান হইতেই তিনি সঙ্কলন করুন, সাংখ্য হইতে যাহা লইয়াছেন, তাহা জাজ্জ্বল্যমান। সাংখ্যদর্শন না হইলে ভগবদ্গীতা হইত না।

সহস্র বৎসর কাল বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত মধ্যে যে সময়টি সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র এবং সৌষ্ঠব লক্ষণযুক্ত, সেই সময়টিতেই বৌদ্ধধর্ম্ম এই ভারতভূমির প্রধান ধর্ম্ম ছিল। ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত হইয়া, সিংহলে, নেপালে, তিব্বতে, চীনে, ব্রহ্মে, শ্যামে, এই ধর্ম্ম অদ্যাপি ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সেই বৌদ্ধধর্ম্মের আদি এই সাংখ্যদর্শনে। বেদে অবজ্ঞা, নির্ব্বাণ, এবং নিরীশ্বরতা বৌদ্ধধর্ম্মে এই তিনটী নূতন; এই তিনটিই ঐ ধর্ম্মের কলেবর। উপস্থিত লেখক কর্ত্তৃক ১০৬ সংখ্যক কলিকাতা রিবিউতে "বৌদ্ধধর্ম্ম এবং সাংখ্য দর্শন" ইতি প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, এই তিনটিরই মূল সাংখ্যদর্শনে। নির্ব্বাণ, সাংখ্যের মুক্তির পরিমাণ মাত্র। বেদের অবজ্ঞা সাংখ্যে প্রকাশ্যে কোথাও

* ৪র্থ অধ্যায়, ১৩ সূত্র।

নাই, বরং বৈদিকতার আড়ম্বর অনেক। কিন্তু সাংখ্যপ্রবচনকার বেদের দোহাই দিয়া শেষে বেদের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন।*

কথিত হইয়াছে যে, যত লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, তত সংখ্যক অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক পৃথিবীতে নাই। সংখ্যা সম্বন্ধে খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা তৎপরবর্ত্তী। সুতরাং যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, পৃথিবীতে অবতীর্ণ মনুষ্যমধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের জীবনের উপর প্রভুত্ব করিয়াছেন, তখন আমরা প্রথমে শাক্যসিংহের, তৎপরে যীশু খ্রীষ্টের নাম করিব। কিন্তু শাক্যসিংহের সঙ্গে সঙ্গে কপিলেরও নাম করিতে হইবে।

অতএব স্পষ্টাক্ষরে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে যে সকল দর্শনশাস্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছে, সাংখ্যের ন্যায় কেহ বহু ফলোৎপাদক হয় নাই। প্লেতো বা আরিস্ততল, বেকন বা দেকার্ত, অধিকতর শুভ ফলের বীজবপন করিয়া থাকিবেন কিন্তু ফলবাহুল্যে কপিলের সৃষ্টি ভূতলে অদ্বিতীয়। সেই সৃষ্টির সকল পরিণাম যে শুভ নহে, সে দোষ কপিলের নয়। যে ভূমিতে তাহার বীজ পড়িয়াছে, অনেক দোষ সেই ভূমিরই।

সাংখ্যের প্রথমোৎপত্তি কোন কালে হইয়াছিল, তাহা স্থির করা অতি কঠিন। সম্ভবতঃ উহা বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। কিম্বদন্তী আছে যে, কপিল উহার প্রণেতা। এ কিম্বদন্তীর প্রতি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু তিনি কে, কোন দেশীয় ব্যক্তি, কোন কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, তাদৃশ বুদ্ধিশালী ব্যক্তি পৃথিবীতে অল্পই

* বৌদ্ধধর্ম্ম যে সাংখ্যমূলক, তাহার প্রমাণ সবিস্তারে দিবার স্থান এ নহে।

জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, যে আমরা "নিরীশ্বর সাংখ্যকেই" সাংখ্য বলিতেছি। পতঞ্জলি প্রণীত যোগশাস্ত্রকে সেশ্বর সাংখ্য বলিয়া থাকে। এ প্রবন্ধে তাহার কোন কথা নাই।

সাংখ্য দর্শন অতি প্রাচীন হইলেও, বিশেষ প্রাচীন কোন সাংখ্য গ্রন্থ দেখা যায় না। সাংখ্য প্রবচনকে অনেকেই কপিল সূত্র বলেন, কিন্তু তাহা কখনই কপিলপ্রণীত নহে। উহা যে বৌদ্ধ, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনের প্রচারের পরে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ ঐ গ্রন্থমধ্যে আছে। ঐ সকল দর্শনের মত সাংখ্যপ্রবচনে খণ্ডন করা দেখা যায়। তদ্ভিন্ন সাংখ্যকারিকা, তত্ত্ব সমাস, ভোজবার্ত্তিক, সাংখ্যসার, সাংখ্য-প্রদীপ, সাংখ্যতত্ত্ব প্রদীপ ইত্যাদি গ্রন্থ, এবং এই সকল গ্রন্থের ভাষ্য টীকা প্রভৃতি বহুল গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত অভিনব। কপিল, অর্থাৎ সাংখ্য দর্শনের প্রথম অধ্যাপকের যে মত, তাহাই আমাদিগের আদরণীয় ও সমালোচ্য; এবং যাহা কপিল সূত্র বলিয়া চলিত, তাহাই আমরা অবলম্বন করিয়া, অতি সংক্ষেপে সাংখ্য দর্শনের স্থূল উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবার যত্ন করিব। আমরা যাহা কিছু বলিতেছি, তাহাই যে সাংখ্যের মত, এমত বিবেচনা কেহ না করেন। যাহা কিছু বলিলে সাংখ্যের মত ভাল করিয়া বুঝা যায়, আমরা তাহাই বলিব।

কতক গুলি বিজ্ঞ লোকে বলেন, এ সংসার সুখের সংসার। আমরা সুখের জন্য এ পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি। যাহা কিছু দেখি, জীবের সুখের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে। জীবের সুখ বিধান করিবার জন্যই সৃষ্টিকর্ত্তা জীবকে সৃষ্ট করিয়াছেন। সৃষ্ট জীবের মঙ্গলার্থ সৃষ্টিমধ্যে কত কৌশল, কে না দেখিতে পায়?

আবার কতক গুলিন লোক আছেন, তাঁহারাও বিজ্ঞ—তাঁহারা বলেন, সংসারে সুখ ত কই দেখি না—দুঃখেরই প্রাধান্য। সৃষ্টিকর্ত্তা কি অভিপ্রায়ে জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না—তাহা মনুষ্যবুদ্ধির বিচার্য্য নহে—কিন্তু সে অভিপ্রায় যাহাই হউক, সংসারে জীবের সুখের অপেক্ষা অসুখ অধিক। তুমি বলিবে, ঈশ্বর যে সকল নিয়ম অবধারিত করিয়া দিয়াছেন, সে গুলি রক্ষা করিয়া চলিলেই কোন দুঃখ নাই, নিয়মের লঙ্ঘনপৌনঃপুন্যেই এত দুঃখ। আমি বলি, যেখানে ঈশ্বর সেই সকল নিয়ম এমত করিয়াছেন যে, তাহা অতি সহজেই লঙ্ঘন করা যায়, এবং তাহা লঙ্ঘনের প্রবৃত্তিও অতি বলবতী করিয়া দিয়াছেন, তখন নিয়ম লঙ্ঘন ব্যতীত নিয়ম রক্ষা যে তাঁহার অভিপ্রায়, এ কথা কে বলিবে? মাদক সেবন পরিণামে মনুষ্যের অত্যন্ত দুঃখদায়ক—তবে মাদক সেবনের প্রবৃত্তি মনুষ্যের হৃদয়ে রোপিত হইয়াছে কেন? এবং মাদকসেবন এত সুসাধ্য এবং আশুসুখকর কেন? কতক গুলি নিয়ম এত সহজে লঙ্ঘনীয় যে, তাহা লঙ্ঘন করিবার সময় কিছুই জানিতে পারা যায় না। ডাক্তার আঙ্গস স্মিথের পরীক্ষায় সপ্রমাণ হইয়াছে যে, অনেক সময়ে মহৎ অনিষ্টকারী কার্ব্বণিক আসিডপ্রধান বায়ু নিশ্বাসে গ্রহণ করিলে আমাদের কোন কষ্ট হয় না। বসন্তাদি রোগের বিষবীজ কখন আমাদিগের শরীরে প্রবেশ করে, তাহা আমরা জানিতেও পারি না। অনেক গুলি নিয়ম এমন আছে যে, তাহার উল্লঙ্ঘনে আমরা সর্ব্বদা কষ্ট পাইতেছি; কিন্তু সে নিয়ম কি, তাহা আমাদিগের জানিবার শক্তি নাই। ওলাউঠা রোগ কেন জন্মে, তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারিলাম না। অথচ লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর ইহাতে কত দুঃখ পাইতেছে। যদি নিয়মটি লঙ্ঘনের

ক্ষমতা দিয়া নিয়মটি জানিতে দেন নাই, তবে জীবের মঙ্গল কামনা কোথা? পণ্ডিত পিতার পুত্র গণ্ডমূর্খ; তাহার মূর্খতার যন্ত্রণায় পিতা রাত্রি দিন যন্ত্রণা পাইতেছেন। মনে কর, শিক্ষার অভাবে সে মূর্খতা জন্মে নাই। পুত্রটি স্থূলবুদ্ধি লইয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। কোন্ নিয়ম লঙ্ঘন করায় পুত্রের মস্তিষ্ক অসম্পূর্ণ, এ নিয়ম কি কখন মনুষ্যবুদ্ধির আয়ত্ত হইবে? মনে কর, ভবিষ্যতে হইবে। তবে যত দিন সে নিয়ম আবিষ্কৃত না হইল, ততদিন যে মনুষ্যজাতি দুঃখ পাইবে, ইহা সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত নহে, কেমন করিয়া বলিব?

আবার, আমরা সকল নিয়ম রক্ষা করিতে পারিলেও যে দুঃখ পাইব না, এমতও দেখি না। একজন নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে, আর একজন দুঃখভোগ করিতেছে। আমার প্রিয়বন্ধু আপনার কর্ত্তব্য সাধনার্থ রণক্ষেত্রে গিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, আমি তাঁহার বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিলাম। আমার জন্মিবার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে মন্দ আইন বা মন্দ রাজশাসন হইয়াছে, আমি তাহার ফলভোগ করিতেছি। কাহারও পিতামহ ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন, পৌত্র কোন নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়াও ব্যাধিগ্রস্ত হইতে পারে।

আবার, গোটাকত এমন গুরুতর বিষয় আছে,যে স্বাভাবিক নিয়মানুবর্ত্তী হওয়াতেও দুঃখ। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে মালথসের মত,ইহার একটী প্রমাণ। এক্ষণে সুবিবেচকেরা সকলেই স্বীকার করেন যে, মনুষ্য সাধারণতঃ নৈসর্গিক নিয়মানুসারে আপন আপন স্বভাবের পরিতোষ করিলেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

অতএব সংসার কেবল দুঃখময়, ইহা বলিবার যথেষ্ট কারণ

আছে। সাংখ্যকারও তাহাই বলেন। সেই কথাই সাংখ্যদর্শন ও বৌদ্ধধর্ম্মের মূল।

কিন্তু পৃথিবীতে যে কিছু সুখ আছে, তাহাও অস্বীকার্য্য নহে। সাংখ্যকার বলেন যে, সুখ অল্প। কদাচ কেহ সুখী, (৬ অধ্যায় ৭ সূত্র) এবং সুখ, দুঃখের সহিত এরূপ মিশ্রিত যে বিবেচকেরা তাহা দুঃখপক্ষে নিক্ষেপ করেন। (ঐ; ৮) দুঃখ হইতে যত ক্লেশ, সুখ হইতে তাদৃশ সুখাকাঙ্ক্ষা জন্মে না। (ঐ, ৬) অতএব দুঃখেরই প্রাধান্য।

সুতরাং মনুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য দুঃখমোচন। এই জন্য সাংখ্যপ্রবচনের প্রথম সূত্র "অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ।"

এই পুরুষার্থ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহারই পর্য্যালোচনা সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্য। দুঃখে পড়িলেই লোকে তাহার একটা নিবারণের উপায় করে। ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছ, আহার কর। পুত্রশোক পাইয়াছ, অন্য বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট কর। কিন্তু সাংখ্যকার বলেন যে, এ সকল উপায়ে দুঃখ নিবৃত্তি নাই; কেন না আবার সেই সকল দুঃখের অনুবৃত্তি আছে। তুমি আহার করিলে, তাহাতে তোমার আজিকার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল, কিন্তু আবার কালি ক্ষুধা পাইবে। বিষয়ান্তরে চিত্ত রত করিয়া, তুমি এবার পুত্রশোক নিবারণ করিলে, কিন্তু আবার অন্য পুত্রের জন্য তোমাকে হয় ত সেইরূপ শোক পাইতে হইবে। পরন্তু এরূপ উপায় সর্ব্বত্র সম্ভবে না। তোমার হস্ত পদ ছিন্ন হইলে, আর লগ্ন হইবে না। যেখানে সম্ভবে, সেখানেও তাহা সদুপায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অন্য বিষয়ে নিরত হইলেই পুত্রশোক বিস্মৃত হওয়া যায় না। (১ অধ্যায় ৪ সূত্র)।

তবে এ সকল দুঃখ নিবারণের উপায় নহে। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ কোম্তের শিষ্য বলিবেন, তবে আর দুঃখ নিবারণের কি উপায় আছে? আমরা জানি যে, জলসেক করিলেই অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, কিন্তু শীতল ইন্ধন পুনর্জ্জ্বালিত হইতে পারে বলিয়া তুমি যদি জলকে অগ্নিনাশক না বল, তবে কথা ফুরাইল। তাহা হইলে দেহধ্বংস ভিন্ন আর জীবের দুঃখনিবৃত্তি নাই।

সাংখ্যকার তাহাও মানেন না। তিনি জন্মান্তর মানেন, এবং লোকান্তরে জন্ম পৌনঃপুন্য আছে ভাবিয়া,এবং সেখানেও জরামরণাদিজ দুঃখ সমান ভাবিয়া তাহাও দুঃখনিবারণের উপায় বলিয়া গণ্য করেন না। (৩ অধ্যায়; ৫২-৫৩ সূত্র) আত্মা, বিশ্বকারণে বিলীন হইলেও তদবস্থাকে দুঃখনিবৃত্তি বলেন না, কেন না যে জলমগ্ন, তাহার আবার উত্থান আছে। (উ ৫৪)

তবে দুঃখ নিবারণ কাহাকে বলি? অপবর্গই দুঃখনিবৃত্তি।

অপবর্গই বা কি? "দ্বয়োরেকতরস্য বৌদাসীন্যমপবর্গঃ।" (তৃতীয় অধ্যায় ৬৫ সূত্র,) সেই অপবর্গ কি, এবং কি প্রকারে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পর পরিচ্ছেদে সবিশেষ বলিব। "অপবর্গ" ইত্যাদি প্রাচীন কথা শুনিয়া পাঠক ঘৃণা করিবেন না। যাহা প্রাচীন, তাহাই যে উপধর্ম্মকলঙ্কিত, বা সর্ব্বজন-পরিজ্ঞাত, এমত মনে করিবেন না। বিবেচক দেখিবেন, সাংখ্যদর্শনে একটু সারও আছে। অসার বৃক্ষে এমন স্থায়ী ফল ফলিবে কেন?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।—বিবেক।

আমি দুঃখ ভোগ করি—কিন্তু আমি কে? বাহ্যপ্রকৃতিভিন্ন আর কিছুই আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। তুমি বলিতেছ, আমি বড় দুঃখ পাইতেছি,—আমি বড় সুখী। কিন্তু একটি মনুষ্যদেহ ভিন্ন, "তুমি" বলিব, এমন কোন সামগ্রী দেখিতে পাই না। তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া, ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগোচর। তবে কি তোমার দেহেরই এই সুখ দুঃখ ভোগ বলিব?

তোমার মৃত্যু হইলে, তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে; কিন্তু তৎকালে তাহার সুখ দুঃখ ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে অপমান করিয়াছে; তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, তথাপি তুমি দুঃখী। তবে তোমার দেহ দুঃখভোগ করে না। যে দুঃখ ভোগ করে, সে স্বতন্ত্র। সেই তুমি। তোমার দেহ তুমি নহে।

এইরূপ সকল জীবের। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জগতের কিয়দংশ ইন্দ্রিয়গোচর, কিয়দংশ অনুমেয় মাত্র, ইন্দ্রিয়-গোচর নহে, এবং সুখ দুঃখাদির ভোগকর্ত্তা। যে সুখ দুঃখাদির ভোগকর্ত্তা, সেই আত্মা। সাংখ্যে তাহার নাম পুরুষ। পুরুষ ভিন্ন জগতে আর যাহা কিছু আছে, তাহা প্রকৃতি।

আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা কহেন যে, আমাদিগের সুখ দুঃখ মানসিক বিকারমাত্র। সেই সকল মানসিক বিকার কেবল মস্তিষ্কের ক্রিয়া মাত্র। তুমি আমার অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ করিলে, বিদ্ধ স্থানস্থিত স্নায়ু তাহাতে বিচলিত হইল—সেই বিচলন মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত গেল। তাহাতে মস্তিষ্কের যে বিকৃতি হইল,

তাহাই বেদনা। সাংখ্য মতাবলম্বীরা বলিতে পারেন, "মানি, তাহাই ব্যথা। কিন্তু ব্যথা ভোগ করিল কে? যে ভোগ করিল, সেই আত্মা।" এক্ষণকার অন্য সম্প্রদায়ের মনস্তত্ত্ববিদেরাও প্রায় সেইরূপ বলেন। তাঁহারা বলেন, মস্তিষ্কের বিকারই সুখ দুঃখ বটে, কিন্তু মস্তিষ্ক আত্মা নহে। ইহা আত্মার ইন্দ্রিয় মাত্র। এ দেশীয় দার্শনিকেরা যাহাকে অন্তরিন্দ্রিয় বলেন, উঁহারা মস্তিষ্ককে তাহাই বলেন।

শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষ। কিন্তু দুঃখ ত শারীরাদিক। শরীরাদিতে যে দুঃখের কারণ নাই, এমন দুঃখ নাই। যাহাকে মানসিক দুঃখ বলি, বাহ্যপদার্থই তাহার মূল। আমার বাক্যে তুমি অপমানিত হইলে; আমার বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ। তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার দুঃখ। অতএব প্রকৃতি ভিন্ন কোন দুঃখ নাই। কিন্তু প্রকৃতি ঘটিত দুঃখ পুরুষে বর্ত্তে কেন? "অসঙ্গোয়ম্পুরুষঃ।" পুরুষ একা, কাহারও সংসর্গবিশিষ্ট নহে। (১ অধ্যায় ১৫ সূত্র) অবস্থাদি, সকল শরীরের, আত্মার নহে। (ঐ ১৪ সূত্র) "ন বাহ্যান্তরয়োরুপরজ্যোপরঞ্জক ভাবোপি দেশব্যবধানাৎ শ্রুঘ্নস্থ পাটলিপুত্রস্যয়োরিব।" বাহ্য এবং আন্তরিকের মধ্যে উপরজ্য এবং উপরঞ্জকভাব নাই, কেন না তাহা পরস্পর সংলগ্ন নহে; দেশ ব্যবধানবিশিষ্ট। যেমন একজন পাটলীপুত্রনগরে থাকে, আর একজন শ্রুঘ্ননগরে থাকে, ইহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান তদ্রূপ। তবে পুরুষের দুঃখ কেন?

প্রকৃতির সহিত সংযোগই পুরুষের দুঃখের কারণ। বাহ্যে আন্তরিকে, দেশব্যবধান আছে বটে, কিন্তু কোন প্রকার সংযোগ নাই, এমত নহে। যেমন স্ফাটিকপাত্রের নিকট জবা কুসুম রাখিলে, পাত্র পুষ্পের বর্ণবিশিষ্ট হয় বলিয়া, পুষ্প এবং

পাত্রে একপ্রকার সংযোগ আছে বলা যায়,এ সেইরূপ সংযোগ। পুষ্প এবং পাত্রমধ্যে দেশব্যবধান থাকিলেও পাত্রের বর্ণ বিকৃত হইতে পারে, ইহাও সেইরূপ। এ সংযোগ নিত্য নহে, দেখা যাইতেছে। সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে। সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই, দুঃখের কারণ অপনীত হইল। অতএব এই সংযোগের উচ্ছিত্তিই দুঃখনিবারণের উপায়। সুতরাং তাহাই পুরুষার্থ। "যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থ স্তদুচ্ছি ত্তিঃ পুরুষার্থঃ; (৬,৭০)

সাংখ্যের মত এই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইহার যাথার্থ্য নিরূপণ জন্য কষ্ট পাইতে হয় না। তবে, ইহা বক্তব্য যে, যদি আত্মা শরীর হইতে পৃথক্ হয়, যদি আত্মাই সুখ দুঃখভোগী হয়, যদি আত্মা দেহনাশের পরেও থাকে, যদি দেহ হইতে বিযুক্ত আত্মার সুখ দুঃখাদি ভোগের সম্ভাবনা থাকে, তবে সাংখ্যদর্শনের এ সকল কথা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই "যদি" গুলিন অনেক। আধুনিক পজিটি-বিষ্ট এখনই বলিবেন,

১ম। আত্মা শরীর হইতে পৃথক্ কিসে জানিতেছ? শারীরতত্ত্বে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শরীরই বা শরীরের অংশ বিশেষই আত্মা।

২য়। আত্মাই যে সুখ দুঃখভোগী, তাহারই বা প্রমাণ কি? প্রকৃতি সুখ দুঃখভোগী নহে কেন?

৩য়। দেহনাশের পর যে আত্মা থাকিবে, তাহা ধর্ম্মপুস্তকে বলে; কিন্তু তদ্ভিন্ন অণুমাত্র প্রমাণ নাই। আত্মার নিত্যত্ব যদি মানিতে হয়, তবে ধর্ম্মপুস্তকের আজ্ঞানুসারে; দর্শনশাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে মানিব না।

৪র্থ। দেহধ্বংসের পর আত্মা থাকিলে, তাহার যে আবার

জরা মরণাদিজ দুঃখের সম্ভাবনা আছে, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই।

অতএব যাঁহারা আত্মার পার্থক্য ও নিত্যত্ব মানেন, তাঁহারাও সাংখ্য মানিবেন না। এবং এ সকল মত যে এ কালে গ্রাহ্য হইবে, এমত বিবেচনায় আমরা সাংখ্যদর্শন বুঝাইতে প্রবৃত্ত হই নাই। কিন্তু এক্ষণে যাহা অগ্রাহ্য, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহা আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া। সেই আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া কি, ইহাই বুঝান আমাদিগের অভিপ্রায়।

প্রকৃতি পুরুষের সংযোগের উচ্ছিত্তিই অপবর্গ বা মোক্ষ। তাহা কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়?

সাংখ্যকার বলেন, বিবেকের দ্বারা। কিন্তু কোন্ প্রকার বিবেকের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়? প্রকৃতি বিষয়ে যে অবিবেক, সকল অবিবেক তাহার অন্তর্গত। অতএব প্রকৃতি পুরুষ সম্বন্ধীয় জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়।

অতএব জ্ঞানেই মুক্তি। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল কথা, "জ্ঞানেই শক্তি," (Knowledge is Power.) হিন্দুসভ্যতার মূল কথা, "জ্ঞানেই মুক্তি।" দুই জাতি, দুইটি পৃথক্ উদ্দেশ্যানুসন্ধানে একপথেই যাত্রা করিলেন। পাশ্চাত্যেরা শক্তি পাইয়াছেন—আমরা কি মুক্তি পাইয়াছি? বস্তুতঃ এক যাত্রার যে পৃথক্ ফল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইউরোপীয়েরা শক্তির অনুসারী, ইহাই তাঁহাদিগের উন্নতির মূল। আমরা শক্তির প্রতি যত্নহীন, ইহাই আমাদিগের অবনতির মূল। ইউরোপীয়দিগের উদ্দেশ্য ঐহিক; তাঁহারা ইহকালে জয়ী। আমাদিগের উদ্দেশ পারত্রিক—তাই ইহকালে আমরা জয়ী হইলাম না। পরকালে হইব কি না, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে।

কিন্তু জ্ঞানই মুক্তি, এ কথা সত্য হইলেও ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের পরম লাভ হইয়াছে বলিতে হইবে। প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্ম ক্রিয়াত্মক; প্রাচীন আর্য্যেরা প্রাকৃতিক শক্তির পূজা একমাত্র মঙ্গলোপায় বলিয়া জানিতেন। প্রাকৃতিক শক্তি সকল অতি প্রবল, স্থির, অশাসনীয়, কখন মহা মঙ্গলকর, কখন মহা অমঙ্গলের কারণ,দেখিয়া প্রথম জ্ঞানীরা তাহাদিগকে ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগের স্তুতি এবং উপাসনা করেন। ক্রমে তাঁহাদিগের প্রীত্যর্থ যাগ যজ্ঞাদির বড় প্রবলতা হইল। অবশেষে সেই সকল যাগ যজ্ঞাদিই মনুষ্যের প্রধান কার্য্য এবং পারত্রিক সুখের একমাত্র উপায় বলিয়া, লোকের একমাত্র অনুষ্ঠেয় হইয়া পড়িল। শাস্ত্র সকল কেবল তৎসমুদায়ের আলোচনার্থ সৃষ্ট হইল—প্রকৃত জ্ঞানের প্রতি আর্য্যজাতির তাদৃশ মনোযোগ হইল না। বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, আরণ্যক, এবং সূত্রগ্রন্থ সকল কেবল ক্রিয়াকলাপের কথায় পরিপূর্ণ। যে কিছু প্রকৃত জ্ঞানের চর্চ্চা হইত, তাহা কেবল বেদের আনুসঙ্গিক বলিয়াই। সে সকল শাস্ত্র বেদাঙ্গ বলিয়া খ্যাত হইল। জ্ঞান এইরূপে ক্রিয়ার দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়াতে, তাহার উন্নতি হইল না। কর্ম্মজন্য মোক্ষ, এই বিশ্বাস ভারতভূমে অপ্রতিহত থাকাতেই এরূপ ঘটিয়াছিল। প্রকৃত জ্ঞানের আলোচনার অভাবে বেদভক্তি আরও প্রবলা হইল। মনুষ্যচিত্তের স্বাধীনতা একবারে লুপ্ত হইতে লাগিল। মনুষ্য বিবেকশূন্য মন্ত্রমুগ্ধ শৃঙ্খলবদ্ধ পশুবৎ হইয়া উঠিল।

সাংখ্যকার প্রথম বলিলেন, কর্ম্ম অর্থাৎ হোম যাগাদির অনুষ্ঠান, পুরুষার্থ নহে। জ্ঞানই পুরুষার্থ। জ্ঞানই মুক্তি। কর্ম্মপীড়িত ভারতবর্ষ সে কথা শুনিল। জ্ঞানের আলোচনার

সূত্রপাত হইতে লাগিল। অন্যান্য দর্শনের সৃষ্টি হইতে লাগিল। শাক্যসিংহের পথ পরিষ্কার হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ। সৃষ্টি

অতি প্রাচীন কাল হইতে দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, জগতের আদি কি, তাহা নিরূপিত হয়। আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিকেরা সে তত্ত্ব নিরূপণীয় নহে বলিয়া, এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছেন।

জগতের আদি সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন এই যে, জগৎ সৃষ্ট, কি নিত্য? অনাদিকাল এই রূপ আছে, না কেহ তাহার সৃজন করিয়াছেন?

অধিকাংশ লোকের মত এই যে, জগৎ সৃষ্ট. জগৎকর্ত্তা একজন আছেন। সামান্য ঘট পটাদি একটি কর্ত্তা ব্যতীত হয় না; তবে এই অসীম জগতের কর্ত্তা নাই, ইহা কি সম্ভবে?

আর এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন; তাঁহারা বলেন যে, এই জগৎ যে সৃষ্ট বা ইহার কেহ কর্ত্তা আছেন, তাহা বিবেচনা করিবার কারণ নাই। ইহাদের সচরাচর নাস্তিক বলে; কিন্তু নাস্তিক বলিলেই মূঢ় বুঝায় না। তাঁহারা বিচারের দ্বারা আপন পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন। সেই বিচার অত্যন্ত দুরূহ, এবং এ স্থলে তাহার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই।

তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব একটি পৃথক্ তত্ত্ব, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আর একটি পৃথক্ তত্ত্ব। ঈশ্বরবাদীও বলিতে পারেন যে, "আমি ঈশ্বর মানি, কিন্তু সৃষ্টিক্রিয়া

মানি না। ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা, তাঁহার কৃত নিয়ম দেখিতেছি, নিয়মাতিরিক্ত সৃষ্টির কথা আমি বলিতে পারি না।”

এক্ষণকার কোন কোন খ্রীষ্টীয়ান এই মতাবলম্বী। ইহার মধ্যে কোন্ মত অযথার্থ, কোন্ মত যথার্থ, তাহা আমরা কিছুই বলিতেছি না। যাঁহার যাহা বিশ্বাস, তদ্বিরুদ্ধ আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। আমাদের বলিবার কেবল এই উদ্দেশ্য যে, সাংখ্যকারকে প্রায় এই মতাবলম্বী বলিয়া বোধ হয়। সাংখ্যকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না, তাহা পশ্চাৎ বলিব। কিন্তু তিনি “সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা” পুরুষ মানেন, এইরূপ পুরুষ মানিয়াও তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলেন না; সৃষ্টিই মানেন না। এই জগৎ প্রাকৃতিক ক্রিয়া মাত্র বলিয়া স্বীকার করেন।

(ক)র কারণ (খ); (খ)র কারণ (গ); (গ)র কারণ (ঘ); এই রূপ কারণ পরম্পরা অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশ্য একস্থানে অন্ত পাইয়া যাইবে; কেন না কারণশ্রেণী কখন অনন্ত হইতে পারে না। আমি যে ফলটী ভোজন করিতেছি, ইহা অমুক বৃক্ষে জন্মিয়াছে; সেই বৃক্ষ একটী বীজে জন্মিয়াছে; সেই বীজ অন্যবৃক্ষের ফলে জন্মিয়াছিল; সেই বৃক্ষও আর একটী বীজে জন্মিয়াছিল। এই রূপে অনন্তানুসন্ধান করিলেও অবশ্য একটী আদিম বীজ মানিতে হইবে। এইরূপ জগতে যাহা আদিম বীজ, যেখানে কারণানুসন্ধান বন্ধ হইবে, সাংখ্যকার সেই আদিম কারণকে মূল প্রকৃতি বলেন। (১৭৪)

জগদুৎপত্তি সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, যে মূল কারণ যাহাই হউক, সেই কারণ হইতে এই বিশ্ব সংসার কি প্রকারে এই রূপাবয়বাদি প্রাপ্ত হইল? সাংখ্যকারের উত্তর এই;—

এই জাগতিক পদার্থ পঞ্চবিংশতি প্রকার,—

১। পুরুষ।

২। প্রকৃতি।

৩। মহৎ।

৪। অহঙ্কার।

৫, ৬, ৭, ৮, ৯ পঞ্চতন্মাত্র।

১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ ১৮, ১৯, ২০ একাদশেন্দ্রিয়।

২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫ স্থূলভূত।

ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ, এবং আকাশ স্থূলভূত। পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং অন্তরিন্দ্রিয়, এই একাদশ ইন্দ্রিয়। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পাঁচটি তন্মাত্র। "আমি" জ্ঞান, "অহঙ্কার।" মহৎ মন।

স্থূলভূত হইতে পঞ্চতন্মাত্রের জ্ঞান। আমরা শুনিতে পাই, এ জন্য শব্দ আছে। আমরা দেখিতে পাই, এ জন্য দৃশ্য অর্থাৎ রূপ আছে। ইত্যাদি।

অতএব শব্দস্পর্শাদির অস্তিত্ব নিশ্চিত, কিন্তু শব্দ আমি শুনি, রূপ আমি দেখি। তবে "আমিও" আছি। অতএব তন্মাত্র হইতে অহঙ্কারের অস্তিত্ব অনুভূত হইল।

আমি আছি কেন বলি? আমার মনে ইহা উদয় হইয়াছে, সেই জন্য। তবে মনও আছে। (Cogito ergo sum) অতএব অহঙ্কার হইতে মনের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইল।

মনের সুখ দুঃখ আছে। সুখ দুঃখের কারণ আছে। অতএব মূল কারণ প্রকৃতি আছে।

সাংখ্যকার বলেন, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং একাদশেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র হইতে স্থূলভূত।

এ তত্ত্বের আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। একালে ইহা

বড় সঙ্গত বা অর্থযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্রে যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় পুরাণ সকলে যে সৃষ্টিক্রিয়া বর্ণিত আছে, তাহা এই সাংখ্যের মতে ব্রহ্মাণ্ডের কথার সংযোগ মাত্র। যথা বিষ্ণুপুরাণে;—

আকাশবায়ুতেজাংসি সলিলং পৃথিবী তথা।
শব্দাদিভির্গুণৈর্ব্রহ্মন্ সংযুক্তান্যুত্তরোত্তরৈঃ॥
শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ বিশেষাস্তেন তে স্মৃতঃ।
নানাবীর্য্যাঃপৃথগ্‌ভূতাস্ততস্তে সংহতিং বিনা॥
নশক্লুবন্ প্রজা স্রষ্টুমসমাগম্যাকৃৎস্নশঃ।
সমেত্যান্ যোন্যসংযোগং পরস্পর সমাশ্রয়ঃ॥
এক সংঘাতলক্ষশ্চ সম্প্রাপৈক্যং অশেষতঃ।
পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ প্রধানানুগ্রহেণ চ॥
মহদাদিবিশেষান্তা অণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে।
তৎক্রমেণ বিবৃদ্ধস্তু জলবুদ্বুদবৎসমং॥
ভূতেভ্যোণ্ডং মহাবুদ্ধে বৃহত্তদুদকেশয়ং।
প্রাকৃতং ব্রহ্মরূপস্য বিষ্ণোসংস্থানমুত্তমম্॥
তত্রাব্যক্তস্বরূপোসৌ ব্যক্তরূপী জগৎপতিঃ।
বিষ্ণুর্ব্রহ্মর্চ্চরূপেণ স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ॥
মেরুতুল্যমভূত্তস্য জরায়ুশ্চ মহীধরাঃ।
গর্ভোদকং সমুদ্রশ্চ তস্যাসন্ সুমহাত্মনঃ॥
সাদ্রিদ্বীপসমুদ্রাশ্চ সজ্যোতির্লোকসংগ্রহঃ।
তস্মিন্নণ্ডেভবদ্বিপ্র সদেবাসুরমানুষঃ॥
বারিবহ্ন্যানিলাকাশৈস্ততোভূতাদিনাবহিঃ।
বৃতং দশগুণৈরণ্ডং ভূতাদির্মহতা তথা॥

অব্যক্তেনাবৃতো ব্রহ্মং স্তৈঃসর্ব্বৈঃ সহিতোমহান্।
এভিরাবরণৈরণ্ডং সপ্তভিপ্র্ক্বতৈর্বৃতম্॥
নারিকেলফলস্যান্তর্বীজং বাহ্যদলৈরিব।
জুষন্ রজোগুণস্তত্র স্বয়ং বিশ্বেশ্বরো হরিঃ॥
ব্রহ্মভূত্বাস্যজগতোবিসৃষ্টৌ সম্প্রবর্ত্ততে॥

পুনশ্চ লিঙ্গপুরাণে ;—

মহদাদি বিশেষান্তাহ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি চ।
জলবুদ্বুদবত্তস্মাদবতীর্ণঃ পিতামহঃ॥
সএবভগবান্ রুদ্রো বিষ্ণুর্বিশ্বগতঃ প্রভুঃ।
তস্মিন্নণ্ডেত্বিমে লোকা অণ্ডর্বিশ্বমিদং জগৎ॥
অণ্ডং দশগুণানেব নভসাবাহ্যতো বৃতং।
আকাশশ্চাবৃতস্তদ্বদহঙ্কারেণ শব্দজঃ॥
দহতা শব্দহেতুর্বৈপ্রধানেনাবৃতঃ স্বয়ম্॥

পুনশ্চ ভাগবত পুরাণে ;—

দৈবেন দুর্বিতর্ক্যেন পরেণানিমিষেণ চ।
জাতক্ষোভাদ্ভগবতো মহানাসীদ্গুণত্রয়াৎ॥
রজঃপ্রধানান্মহত স্ত্রিলিঙ্গো দৈবচোদিতাৎ।
জাতঃ সসর্জ্জভূতাদি বিষাদিদিনি পঞ্চশঃ॥

পুনশ্চ ভাগবতে ;—

এতান্যসংহৃত্য যদা মহদাদিনি সপ্ত বৈ।
কালকর্ম্মগুণোপেতো জগদাদিরুপাবিশৎ॥
ততস্তেনানুবিদেভ্যো যুক্তেভ্যোণ্ডমচেতনম্।
উত্থিতং প্ররুষো যস্মাদুদতিষ্ঠদসৌ বিরাট্॥

এ সকলের আলোচনায় দুইটি কথা অনুভূত হয় ;—

১ম। বেদে কোথাও সাংখ্য দর্শনানুযায়ী সৃষ্টি কথিত হয়

নাই। ঋগ্বেদে, অথর্ব্ববেদে, শতপথব্রাহ্মণে সৃষ্টি কথন আছে, কিন্তু তাহাতে মহদাদির কোন উল্লেখ নাই। মনুতেও সৃষ্টি কথন আছে, তাহাতেও নাই, রামায়ণেও ঐ রূপ। কেবল পুরাণে আছে। অতএব বেদ, মনু, রামায়ণের পরে ও অন্ততঃ বিষ্ণু ভাগবত এবং লিঙ্গ পুরাণের পুর্ব্বে সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টি। মহাভারতেও সাংখ্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু মহাভারতের কোন অংশ নূতন, কোন অংশ পুরাতন, তাহা নিশ্চিৎ করা ভার। কুমারসম্ভবের দ্বিতীয় সর্গে যে ব্রহ্মস্তোত্র আছে তাহা সাংখ্যানুকারী।

২য়। সাংখ্য প্রবচনে বিষ্ণু, হরি রুদ্রাদির উল্লেখ নাই। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, পৌরাণিকেরা নিরীশ্বর সাংখ্যকে আপন মনোমত করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নিরীশ্বরতা।

সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর বলিয়া খ্যাত, কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে সাংখ্য নিরীশ্বর নহে। ডাক্তার হল একজন এই মতাবলম্বী। মক্ষমূলর, এই মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার মত পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা গিয়াছে। কুসুমাঞ্জলিকর্ত্তা উদয়নাচার্য্য বলেন যে সাংখ্য মতাবলম্বীরা আদি বিদ্বানের উপাসক। অতএব তাঁহার মতেও সাংখ্য নিরীশ্বর নহে। সাংখ্যপ্রবচনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুও বলেন যে ঈশ্বর নাই, এ কথা বলা কাপিল সূত্রের উদ্দেশ্য নহে। অতএব সাংখ্যদর্শনকে কেন নিরীশ্বর বলা যায়, তাহার কিছু বিস্তারিত লেখা যাউক।

সাংখ্যপ্রবচনের প্রথমাধ্যায়ের বিখ্যাত ৯২ সূত্র এই কথার মূল। সে সূত্র এই; "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।" প্রথম এই সূত্রটি বুঝাইব।

সূত্রকার প্রমাণের কথা বলিতেছিলেন। তিনি বলেন প্রমাণ ত্রিবিধ; প্রত্যক্ষ, অনুমান, এবং শব্দ। ৮৯ সূত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলেন, "যৎ সম্বদ্ধং সত্তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্।" অতএব যাহা সম্বদ্ধ নহে, তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এই লক্ষণ প্রতি দুইটি দোষ পড়ে। যোগিগণ যোগবলে অসম্বদ্ধও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ৯০।৯১ সূত্রকার সে দোষ অপনীত করিলেন। দ্বিতীয় দোষ, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নিত্য, তৎসম্বন্ধে সম্বদ্ধ কথাটি ব্যবহার হইতে পারে না। সূত্রকার তাহার এই উত্তর দেন, যে ঈশ্বরই সিদ্ধ নহেন—ঈশ্বর আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই—অতএব তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে না বর্ত্তিলে এই লক্ষণ দুষ্ট হইল না। তাহাতে ভাষ্যকার বলেন যে দেখ, ঈশ্বর অসিদ্ধ ইহা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর নাই, এমত কথা বলা হইল না।

না হউক, তথাপি এই দর্শনকে নিরীশ্বর বলিতে হইবে। এমত নাস্তিক বিরল, যে বলে যে ঈশ্বর নাই। যে বলে যে ঈশ্বর আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই, তাহাকেও নাস্তিক বলা যায়।

যাহার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এবং যাহার অনস্তিত্বের প্রমাণ আছে, এইদুইটী পৃথক্ বিষয়। রক্তবর্ণ কাকের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু তাহার অনস্তিত্বেরও কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু গোলাকার চতুষ্কোণের অনস্তিত্বের প্রমাণ আছে। গোলাকার চতুষ্কোণ মানিব না, ইহা নিশ্চিত; কিন্তু রক্তবর্ণ কাক মানিব কি না? তাহার অনস্তিত্বেরও প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু

তাহার অস্তিত্বেরও প্রমাণ নাই। যেখানে অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, সেখানে মানিব না। অনস্তিত্বের প্রমাণ নাই থাক, যতক্ষণ অস্তিত্বের প্রমাণ না পাইব, ততক্ষণ মানিব না। অস্তিত্বের প্রমাণ পাইলে তখন মানিব। ইহাই প্রত্যয়ের প্রকৃত নিয়ম। ইহার ব্যত্যয়ে যে বিশ্বাস তাহা ভ্রান্তি। "কোন পদার্থ আছে এমত প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু থাকিলে থাকিতে পারে," ইহা ভাবিয়া যে সেই পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করে সে ভ্রান্ত।

অতএব নাস্তিকেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। যাঁহারা কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাববাদী,—তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর থাকিলে থাকিতে পারেন,—কিন্তু আছেন এমত কোন প্রমাণ নাই।

অপর শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলেন যে ঈশ্বর আছেন, শুধু ইহারই প্রমাণাভাব, এমত নহে, ঈশ্বর যে নাই, তাহারও প্রমাণ আছে। আধুনিক ইউরোপীয়েরা কেহ কেহ এই মতাবলম্বী। একজন ফরাসিস লেখক বলিয়াছেন, তোমরা বল ঈশ্বর নিরাকার, অথচ চেতনাদি মানসিক বৃত্তিবিশিষ্ট। কিন্তু কোথায় দেখিয়াছ যে চেতনাদি মানসিক বৃত্তি সকল শরীর হইতে বিযুক্ত? যদি তাহা কোথাও দেখ নাই, তবে হয় ঈশ্বর সাকার নয় তিনি নাই। সাকার ঈশ্বর, এ কথা তোমরা মানিবে না, অতএব ঈশ্বর নাই, ইহা মানিতে হইবে। ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাস্তিক।

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।" শুধু এই কথার উপর নির্ভর করিলে, সাংখ্যকারকে প্রথম শ্রেণীর নাস্তিক বলা যাইত। কিন্তু তিনি অন্যান্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন, যে ঈশ্বর নাই।

সে প্রমাণ কোথাও দুই একটি সূত্রের মধ্যে নাই। অনেক

গুলিন সূত্র একত্র করিয়া, সাংখ্যপ্রবচনে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব-সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহার মর্ম্ম সবিস্তারে বুঝাইতেছি।

তিনি বলেন যে ঈশ্বর অসিদ্ধ (১,৯২) প্রমাণ নাই বলিয়াই অসিদ্ধ (প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ) (৫,১০)। সাংখ্যমতে প্রমাণ তিন প্রকার, প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ। প্রত্যক্ষের ত কথাই নাই। কোন বস্তুর সঙ্গে যদি অন্য বস্তুর নিত্য সম্বন্ধ থাকে, তবে একটি দেখিলে আর একটিকে অনুমান করা যায়। কিন্তু কোন বস্তুর সঙ্গে ঈশ্বরের কোন নিত্য সম্বন্ধ দেখা যায় নাই; অতএব অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় না। (সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্ ৫,১১)

যদি এই সূত্র পাঠক না বুঝিয়া থাকেন, তবে আর একটু বুঝাই। পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া তুমি সিদ্ধ কর, যে তথায় অগ্নি আছে। কেন এ সিদ্ধান্ত কর? তুমি যেখানে যেখানে ধূম দেখিয়াছ, সেইখানে সেইখানে অগ্নি দেখিয়াছ বলিয়া। অর্থাৎ অগ্নির সহিত ধূমের নিত্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া।

যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তোমার প্রপিতামহের প্রপিতামহের কয়েটি হাত ছিল, তুমি বলিবে দুইটি। তুমি তাঁহাকে কখন দেখ নাই—তবে কি প্রকারে জানিলে তাঁহার দুইটী হাত ছিল? বলিবে মানুষ মাত্রেরই দুই হাত এই জন্য। অর্থাৎ মানুষত্বের সহিত দ্বিভুজতার নিত্য সম্বন্ধ আছে, এই জন্য।

এই নিত্য সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিই অনুমানের একমাত্র কারণ। যেখানে এ সম্বন্ধ নাই, সেখানে পদার্থান্তর অনুমিত হইতে পারে না। এক্ষণে, জগতে কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ আছে, যে তাহা হইতে ঈশ্বরানুমান করা যাইতে পারে? সাংখ্যকার বলেন কিছুরই সঙ্গে না।

তৃতীয় প্রমাণ, শব্দ। আপ্ত বাক্য শব্দ। বেদই আপ্তোপ-

দেশ। সাংখ্যকার বলেন, বেদে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই, বরং বেদে ইহাই আছে যে সৃষ্টি প্রকৃতিরই ক্রিয়া, ঈশ্বরকৃত নহে (শ্রুতিরপি প্রধান কার্য্যত্বস্য) ৫,১২) কিন্তু যিনি বেদ পাঠ করিবেন তিনি দেখিবেন, এ অতি অসঙ্গত কথা। এই আশঙ্কায় সাংখ্যকার বলেন যে বেদে ঈশ্বরের যে উল্লেখ আছে, তাহা হয় মুক্তাত্মার প্রশংসা, নয় প্রামাণ্য দেবতার (সিদ্ধস্য) উপাসনা। (মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধস্য বা, ১,৯৫)

ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এইরূপে দেখাইয়াছেন। ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে যে প্রমাণ দেখাইয়াছেন, নিম্নে তাহার সম্প্রসারণ করা গেল।

ঈশ্বর কাহাকে বল? যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা এবং পাপপুণ্যের ফলবিধাতা। যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি মুক্ত না বদ্ধ? যদি মুক্ত হয়েন, তবে তাঁহার সৃজনের প্রবৃত্তি হইবে কেন? আর যিনি মুক্ত নহেন, বদ্ধ, তাঁহার পক্ষে অনন্তজ্ঞান ও শক্তি সম্ভবে না। অতএব একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন ইহা অসম্ভব। মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ (১,৯৩) উভয়থাপ্যসৎকরত্বম্ (১৯৪)

সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে এই। পাপপুণ্যের দণ্ডবিধাতৃত্ব সম্বন্ধে মীমাংসা করেন, যে যদি ঈশ্বর কর্ম্মফলের বিধাতা হয়েন, তবে তিনি অবশ্য কর্ম্মানুযায়ী ফলনিষ্পত্তি করিবেন। পুণ্যের শুভ ফল, পাপের অশুভ ফল অবশ্য প্রদান করিবেন। যদি তিনি তাহা না করেন, স্বেচ্ছামত ফলনিষ্পত্তি করেন, তবে কি প্রকারে ফলবিধান করিতে পারেন? যদি সুবিচার করিয়া ফল বিধান না করেন, তবে আত্মোপকারের জন্য করাই সম্ভব। তাহা হইলে তিনি সামান্য লৌকিক রাজার ন্যায় আত্মোপকারী, এবং সুখ দুঃখের অধীন। যদি তাহা না হইয়া কর্ম্মানুযায়ীই ফলনিষ্পত্তি করেন, তবে কেন কর্ম্মকেই ফলবিধাতা বল না?

ফলনিষ্পত্তির জন্য আবার কর্ম্মের উপর ঈশ্বরানুমানের প্রয়োজন কি ?

অতএব সাংখ্যকার দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোরতর নাস্তিক। অথচ তিনি বেদ মানেন।

ঈশ্বর না মানিয়াও কেন বেদ মানেন, তাহা আমরা পর-পরিচ্ছেদে দেখাইব। সাংখ্যের এই নিরীশ্বরতা বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বসূচনা বলিয়া বোধ হয়।

ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনের একটি কথা বাঁকি রহিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অনেকে বলেন কাপিল দর্শন নিরীশ্বর নহে। এ কথা বলিবার কিছু একটু কারণ আছে। তৃ, অ, ৫৭, সূত্রে সূত্রকার বলেন, "ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধিঃ সিদ্ধা।" সে কি প্রকার ঈশ্বর? "সহি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা," ৩,৫৬। তবে সাংখ্য নিরীশ্বর হইল কই ?

বাস্তবিক, এ কথা ঈশ্বর সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই। সাংখ্যকার বলেন জ্ঞানেই মুক্তি, আর কিছুতেই মুক্তি নাই। পুণ্যে, অথবা সত্ত্ববিশাল ঊর্দ্ধ লোকেও মুক্তি নাই, কেন না তথা হইতে পুনর্জন্ম আছে, এবং জরামরণাদি দুঃখ আছে। শেষ এমনও বলেন, যে জগৎ কারণে লয় প্রাপ্ত হইলেও মুক্তি নাই, কেন না তাহা হইতে জলমগ্নের পুনরুত্থানের ন্যায় পুনরুত্থান আছে। (৩৫৪) সেই লয়প্রাপ্ত আত্মা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, যে তিনি "সর্ব্ববিৎ এবং সর্ব্বকর্ত্তা।" ইহাকে যদি ঈশ্বর বলিতে চাও, তবে ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধ। কিন্তু ইনি জগৎ স্রষ্টা বা বিধাতা নহেন। "সর্ব্বকর্ত্তা" অর্থে সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্ব-সৃষ্টিকারক নহে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বেদ।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাংখ্য প্রবচনকার ঈশ্বর মানেন না, বেদ মানেন। বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোন দর্শন বা অন্য শাস্ত্র নাই, যাহাতে ধর্ম্মপুস্তকের প্রামাণ্য স্বীকার করে অথচ ধর্ম্মপুস্তকের বিষয়ীভূত এবং প্রণেতা জগদীশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এই বেদভক্তি ভারতবর্ষে অতিশয় বিস্ময়কর পদার্থ। আমরা এ বিষয়টি কিঞ্চিৎ সবিস্তারে লিখিতে ইচ্ছা করি।

মনু বলেন, বেদশব্দ হইতে সকলের নাম, কর্ম্ম,এবং অবস্থা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বেদ, পিতৃ, দেবতা এবং মনুষ্যের চক্ষু; অশক্য, অপ্রমেয়; যাহা বেদ হইতে ভিন্ন তাহা পরকালে নিষ্ফল, বেদ ভিন্ন গ্রন্থ মিথ্যা। ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, চতুর্ব্বর্ণ, ত্রিলোক, চতুরাশ্রম, সকলই বেদ হইতে প্রকাশ; বেদ মনুষ্যের পরম সাধন; যে বেদজ্ঞ সেই, সৈনাপত্য, রাজ্য, দণ্ডনেতৃত্ব, এবং সর্ব্বলোকাধিপত্যের যোগ্য। যে বেদজ্ঞ সে যে আশ্রমেই থাকুক না কেন, সেই ব্রহ্মে লীন হওয়ার যোগ্য। যাহারা ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু, বেদই তাহাদের পক্ষে পরম প্রমাণ। বেদ অজ্ঞের শরণ,জ্ঞানীদিগেরও শরণ। যাহারা স্বর্গ বা আনন্ত্য কামনা করে, ইহাই তাহাদিগের শরণ। যে ব্রাহ্মণ তিন লোক হত্যা করে, যেখানে সেখানে খায়, তাহার যদি ঋগ্বেদ মনে থাকে, তবে তাহার কোন পাপ হয় না।

শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, বেদান্তর্গত সর্ব্বভূত। বেদ, সকল ছন্দঃ, স্তোম, প্রাণ, এবং দেবতাগণের আত্মা। বেদই আছে। বেদ অমৃত। যাহা সত্য তাহাও বেদ।

বিষ্ণুপুরাণে আছে, দেবাদির রূপ, নাম, কর্ম্ম, প্রবর্ত্তন, বেদশব্দ হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল। অন্যত্র ঐ পুরাণে বিষ্ণুকে বেদময়, ও ঋগ্ যজুঃ সামাত্মক বলা হইয়াছে।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও আছে, যে বেদশব্দ হইতে সর্ব্বভূতের রূপ নাম কর্ম্মাদির উৎপত্তি।

ঋক্‌সংহিতার ও তৈত্তিরীয় সংহিতার মঙ্গলাচরণে সায়নাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন, "বেদ হইতে অখিল জগতের নির্ম্মাণ হইয়াছে।"

এইরূপ সর্ব্বত্র বেদের মাহাত্ম্য। কোন দেশে কোন ধর্ম্মগ্রন্থের, বাইবল, কোরাণ প্রভৃতি কিছুরই, ঈদৃশ মহিমা কীর্ত্তিত হয় নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যে বেদ এইরূপ সকলের পূর্ব্বগামী বা উৎপত্তির স্থল, তাহা কোথা হইতে আসিল। এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, বেদের কর্ত্তা কেহ নাই।—এ গ্রন্থ কাহারও প্রণীত নহে, ইহা নিত্য এবং অপৌরুষেয়। অন্যে বলেন যে ইহা ঈশ্বরপ্রণীত সুতরাং সৃষ্ট এবং পৌরুষেয়। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের কি আশ্চর্য্য বৈচিত্র! সকলেই বেদ মানেন কিন্তু বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন দুইখানি শাস্ত্রীয় গ্রন্থের ঐক্য নাই। যথা—

(১) ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে আছে বেদ পুরুষ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন।

(২) অথর্ব্ব বেদে আছে স্তম্ভ হইতে ঋগ্ যজুষ্ সাম অপাক্ষিত হইয়াছিল।

(৩) অথর্ব্ব বেদে অন্যত্র আছে যে ইন্দ্র হইতে বেদের জন্ম।

(৪) ঐ বেদের অন্যত্র আছে, ঋগ্বেদ কাল হইতে উৎপন্ন।

(৫) ঐ বেদে অন্যত্র আছে, বেদ গায়ত্রীমধ্যে নিহিত।

(৬) শতপথ ব্রাহ্মণে আছে যে অগ্নি হইতে ঋচ্, বায়ু হইতে যজুষ্, এবং সূর্য্য হইতে সাম বেদের উৎপত্তি। ছান্দোগ্য উপনিষদেও ঐরূপ আছে। এবং মনুতেও তদ্রূপ আছে।

(৭) শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র আছে যে বেদ প্রজাপতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল।

(৮) শতপথ ব্রাহ্মণের সেই স্থানেই আছে যে প্রজাপতি বেদসহিত জলমধ্যে প্রবেশ করেন। জল হইতে অণ্ডের উৎপত্তি হয়। অণ্ড হইতে প্রথমে তিন বেদের উৎপত্তি।

(৯) শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র আছে যে বেদ মহাভূতের (ব্রহ্মের) নিশ্বাস।

(১০) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে প্রজাপতি সোমকে সৃষ্টি করিয়া তিন বেদের সৃষ্টি করিয়াছেন।

(১১) বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, প্রজাপতি বাক্ সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা বেদাদি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন।

(১২) শতপথ ব্রাহ্মণে পুনশ্চ আছে, যে মনঃসমুদ্র হইতে বাক্ রূপ সাবলের দ্বারা দেবতারা বেদ খুঁড়িয়া উঠাইয়াছিলেন!

(১৩) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে, যে বেদ প্রজাপতির শ্মশ্রু!!

(১৪) উক্ত ব্রাহ্মণে পুনশ্চ আছে, বাগ্‌দেবী বেদমাতা।

(১৫) বিষ্ণুপুরাণে আছে, বেদ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন। ভাগবত পুরাণে ও মার্কণ্ডেয় পুরাণেও ঐ রূপ।

(১৬) হরিবংশে আছে, গায়ত্রীসম্ভূত ব্রহ্মতেজোময় পুরুষের নেত্র হইতে ঋচ্ ও যজুষ,জিহ্বাগ্র হইতে সাম, এবং মূৰ্দ্ধা হইতে অথর্ব্বের সৃজন হইয়াছিল।

(১৭) মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে আছে যে সরস্বতী এবং বেদ,

বিষ্ণু মন হইতে সৃজন করিয়াছিলেন। শান্তিপর্ব্বে সরস্বতীকে বেদমাতা বলা হইয়াছে।

(১৮) অথর্ব্ব বেদান্তর্গত আয়ুর্ব্বেদে আছে, যে আয়ুর্ব্বেদ ব্রহ্মা মনে মনে জানিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদান্তর্গত বলিয়া অথর্ব্ববেদের ঐরূপ উৎপত্তি বুঝিতে হইবে।

বেদের মন্ত্র,ব্রাহ্মণ,উপনিষদ এবং আরণ্যকে,এবং স্মৃতি,পুরাণ, ও ইতিহাসে বেদোৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ আছে। দেখা যাইতেছে যে এ সকলে বেদের সৃষ্টত্ব এবং পৌরুষেয়ত্ব প্রায় সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে—কদাচিৎ অপৌরুষেয়ত্বও কথিত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী টীকাকার ও দার্শনিকেরা প্রায় অপৌরুষেয়ত্ব বাদী। তাঁহাদিগের মত নিম্নে লিখিত হইতেছে।

(১৯) সায়নাচার্য্য বেদার্থপ্রকাশ নামে ঋগ্বেদের টীকা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলেন যে বেদ অপৌরুষেয়। কিন্তু বেদ মনুষ্যকৃত নহে বলিয়াই অপৌরুষেয় বলেন।

(২০) সায়নাচার্য্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য্যও বেদার্থ প্রকাশ নামে তৈত্তিরীয় যজুর্ব্বেদের টীকা করিয়াছেন। তিনি বলেন বেদ নিত্য। তবে তিনি এই অর্থে নিত্য বলেন, যে কাল আকাশাদি যেমন নিত্য সেইরূপ বেদ। ব্যবহার কালে কালিদাসাদিবাক্যবৎ পুরুষবিরচিত নহে বলিয়া নিত্য। এবং তিনি ব্রহ্মাকে বেদবক্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

(২১) মীমাংসকেরা বলেন বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয় শব্দ নিত্য বলিয়া বেদ নিত্য। শঙ্করাচার্য্য এই মতাবলম্বী।

(২২) নৈয়ায়িকেরা তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, বেদ পৌরুষেয়।—মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের ন্যায়, জ্ঞানী ব্যক্তির কথা প্রামাণ্য বলিয়াই বেদও প্রামাণ্য বোধ হয়। গৌতমসূত্রের

ভাবে বেদকে মনুষ্যপ্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করা তাঁহার ইচ্ছা কি না, নিশ্চিত বুঝা যায় না।

(২৩) বৈশেষিকেরা বলেন, বেদ ঈশ্বরপ্রণীত। কুসুমাঞ্জলিকর্ত্তা উদয়নাচার্য্যের এই মত।

এই সমস্ত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, কেহ বলেন বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়; কেহ বলেন বেদ সৃষ্ট এবং ঈশ্বরপ্রণীত। ইহা ভিন্ন তৃতীয় সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কিন্তু সাংখ্য প্রবচনকারের মত সৃষ্টি ছাড়া। তিনি প্রথমতঃ বলেন, যে বেদ কদাপি নিত্য হইতে পারে না, কেন না বেদেই তাহার কার্য্যত্বের প্রমাণ আছে—যথা "স তপোঽতপ্যত তস্মাৎ তপস্তেপানা ত্রয়ো বেদা অজায়ন্ত।" যেখানে বেদেই বলে যে এই এই রূপে বেদের জন্ম হইয়াছিল, সেখানে বেদ কদাপি নিত্য এবং অপৌরুষেয় হইতে পারে না। কিন্তু যাহা অপৌরুষেয় নহে, তাহা অবশ্য পৌরুষেয় হইবে। কিন্তু সাংখ্যকারের মতে বেদ অপৌরুষেয় নহে, পৌরুষেয়ও নহে। পুরুষ, অর্থাৎ ঈশ্বর নাই, বলিয়া তাহা পৌরুষেয় নহে। সাংখ্যকার আরও বলেন, যে বেদ করিতে যোগ্য যে পুরুষ তিনি হয় মুক্ত নয় বদ্ধ। যিনি মুক্ত তিনি প্রবৃত্তির অভাবে বেদসৃজন করিবেন না; যিনি বদ্ধ তিনি অসর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তৎপক্ষে অক্ষম।

তবে বেদ পৌরুষেয় নহে। অপৌরুষেয়ও নহে। তাহা কি কখন হইতে পারে? সাংখ্যকার বলেন হইতে পারে যথা অঙ্কুরাদি। (৫,৮৪) যাঁহারা হিন্দুদর্শনশাস্ত্রের নাম শুনিলেই মনে করেন, তাহাতে সর্ব্বত্রই আশ্চর্য্য বুদ্ধির কৌশল, তাঁহাদিগের ভ্রম নিবারণার্থ এই কথার বিশেষ উল্লেখ করিলাম। সাংখ্যকারের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাও বিচিত্রা, ভ্রান্তিও বিচিত্রা। সাংখ্যকার যে এমন রহস্যজনক ভ্রান্তিতে অনবধানতা প্রযুক্ত পতিত হইয়া

ছিলেন, আমরা এমত বিবেচনা করি না। আমাদিগের বিবেচনায় সংখ্যকার অন্তরে বেদ মানিতেন না। কিন্তু তাৎকালিক সমাজে ব্রাহ্মণে এবং দার্শনিকে কেহ সাহস করিয়া বেদের অবজ্ঞা করিতে পারিতেন না। এজন্য তিনি মৌখিক বেদভক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যদি বেদ মানিতে হইল তবে অবশ্যকমত প্রতিবাদীদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য স্থানে স্থানে বেদের দোহাই দিয়াছেন। কিন্তু তিনি অন্তরে বেদ মানিতেন বোধ হয় না। বেদ পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে, একথা কেবল ব্যঙ্গ মাত্র। সূত্রকারের এই কথা বলিবার অভিপ্রায় বুঝা যায়, যে "দেখ, তোমরা যদি বেদকে সর্ব্বজ্ঞানযুক্ত বলিতে চাহ, তবে বেদ না পৌরুষেয়, না অপৌরুষেয় হইয়া উঠে। বেদ অপৌরুষেয় নহে, ইহার প্রমাণ বেদে আছে। তবে ইহা যদি পৌরুষেয় হয়, তবে ইহাও বলিতে হইবে, যে ইহা মনুষ্যকৃত, কেন না সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ কেহ নাই, তাহা প্রতিপন্ন করা গিয়াছে।" যদি এ সকল সূত্রের এরূপ অর্থ না করা যায়, তবে অদ্বিতীয় দূরদর্শী দার্শনিক সাংখ্যকারকে অল্পবুদ্ধি বলিতে হয়। তাহা কদাপি বলা যাইতে পারে না।

বেদ যদি পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে, তবে বেদ মানিব কেন? সাংখ্যকার এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন। আজি কালিকার কথা ধরিতে গেলে বোধ হয় এত বড় গুরুতর প্রশ্ন ভারতবর্ষে আর কিছুই নাই। একদল বলিতেছেন, সনাতন ধর্ম্ম বেদমূলক; তোমরা এ সনাতন ধর্ম্মে ভক্তিহীন কেন? তোমরা বেদ মান না কেন? আর এক দল বলিতেছেন, আমরা বেদ মানিব কেন? সমুদায় ভারতবর্ষ এই দুই দলে বিভক্ত। এই দুই প্রশ্নের উত্তর লইয়া বিবাদ হইতেছে। ভারতবর্ষের ভাবী মঙ্গলামঙ্গল এই প্রশ্নের

মীমাংসার উপর নির্ভর করে। হিন্দুগণ সকলেরই কি স্বধর্ম্মে থাকা উচিত? না সকলেরই স্বধর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত? অর্থাৎ আমরা বেদ মানিব? না মানিব না? যদি মানি তবে কেন মানিব?

আর একবার এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। যখন ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া ভারতবর্ষ ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিতেছিল, তখন শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, "তোমরা বেদ মানিবে কেন? বেদ মানিও না।" এই কথা শুনিয়া বেদবিৎ, বেদ ভক্ত, দার্শনিক মণ্ডলী এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছি-লেন। জৈমিনি, বাদরায়ণ, গৌতম, কণাদ, কপিল যাঁহার যেমন ধারণা তিনি তেমনি উত্তর দিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পূর্ব্বে বেদে, কল্পসূত্রে, স্মৃতি গ্রন্থে বা কোথাও এ প্রশ্ন উত্থাপিত বা নিবারিত হয় নাই। তাহার কারণ তৎপূর্ব্বে কেহ কখন বেদের প্রতি সংশয় করে নাই। প্রশ্ন না হইলে কেহ উত্তর দেয় না। সংশয় না হইলে কেহ প্রশ্ন করে না। অতএব প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রে এই প্রশ্নের উত্তর থাকাতে দুইটি কথা জানা যাই-তেছে। প্রথম, আজি কালি ইংরেজি শিক্ষার দোষেই লোকে বেদের অলঙ্ঘনীয়তার প্রতি নূতন সন্দেহ করিতেছে, এমত নহে। এ সন্দেহ অনেক দিন হইতে। প্রাচীন দার্শনিকদিগের পরে শঙ্করাচার্য্য, মাধবাচার্য্য, সায়নাচার্য্য, প্রভৃতি নবেরাও ঐ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়, দেখা যায় যে এ প্রশ্ন বৌদ্ধেরা প্রথম উত্থাপিত করেন, এবং প্রাচীন দার্শনিকেরা প্রথম তাহার উত্তর দান করেন। অতএব বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি সমকালিক বলা যাইতে পারে।

বেদ মানিব কেন? এই প্রশ্নের বিচার সমরে মহারথী মীমাং-সক জৈমিনি। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নৈয়ায়িক গৌতম। নৈয়া-

য়িকেরা বেদ মানেন না, এমত নহে। কিন্তু যে সকল কারণে মীমাংসকেরা বেদ মানেন, নৈয়ায়িকেরা তাহা অগ্রাহ্য করেন। মীমাংসকেরা বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়। নৈয়ায়িকেরা বলেন বেদ আপ্তবাক্য মাত্র। নৈয়ায়িকেরা, মীমাংসকের মত খণ্ডন জন্য যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, মাধবাচার্য্য প্রণীত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ হইতে তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে সংক্ষেপে লেখা গেল।

মীমাংসকেরা বলেন, যে সম্প্রদায়াবিচ্ছেদে বেদকর্ত্তা অস্মর্য্যমান। সকল কথা লোক পরম্পরা স্মৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কাহারও স্মরণ নাই যে কেহ বেদ করিয়াছেন। ইহাতে নৈয়ায়িকেরা আপত্তি করেন যে, প্রলয়কালে সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে যে বেদ প্রণয়ন স্মরণে নাই ইহাতে এমত প্রমাণ হইতেছে না যে প্রলয়পূর্ব্বে বেদ প্রণীত হয় নাই। আর ইহাও তোমরা প্রমাণ করিতে পারিবে না, যে বেদকর্ত্তা কাহা কর্তৃক কখন স্মৃত ছিলেন না। নৈয়ায়িকেরা আরও বলেন যে বেদবাক্য সকল, যেমন কালিদাসাদি বাক্য তেমনি বাক্য, অতএব বেদবাক্যও পৌরুষেয় বাক্য। বাক্যত্ব হেতু, মন্বাদির বাক্যের ন্যায়, বেদবাক্যকেও পৌরুষেয় বলিতে হইবে। আর মীমাংসকেরা বলিয়া থাকেন, যে যেই বেদাধ্যয়ন করে, তাহার পূর্ব্বে তাহার গুরু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে তাহার গুরু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বে তাহার গুরু; এইরূপ যেখানে অনন্ত পারম্পর্য্য আছে, সেখানে বেদ অনাদি। নৈয়ায়িক বলেন, যে মহাভারতাদি সম্বন্ধেও ঐ রূপ বলা যাইতে পারে। যদি বল, যে মহাভারতের কর্ত্তা যে ব্যাস ইহা স্মর্য্যমান, তবে বেদ সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে, যে "ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে। ছন্দাংসি যজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মা-

দজায়ত।” ইতি পুরুষসূক্তে বেদকর্ত্তাও নির্দ্দিষ্ট আছেন। আর মীমাংসকেরা বলেন, যে শব্দ নিত্য, এজন্য বেদ নিত্য। কিন্তু শব্দ নিত্য নহে, কেন না শব্দ সামান্যত্ব বশতঃ ঘটবৎ অস্মদাদির বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। মীমাংসকেরা উত্তর করেন, যে গকারাদির শব্দ শুনিতে পাইলেই আমাদিগের প্রত্যভিজ্ঞান জন্মে যে ইহা গ-কার অতএব শব্দ নিত্য। নৈয়ায়িক বলেন যে সে প্রত্যভিজ্ঞা সামান্য বিষয়ত্ব বশতঃ, যেমন ছিন্ন তৎপরে পুনর্জ্জাত কেশ, এবং দলিত কুন্দ। মীমাংসকেরা আরও বলিয়া থাকেন যে বেদ অপৌরুষেয়, তাহার এক কারণ যে পরমেশ্বর অশরীরী তাঁহার তাল্বাদি বর্ণোচ্চারণ স্থান নাই। নৈয়ায়িকেরা উত্তর করেন যে পরমেশ্বর স্বভাবতঃ অশরীরী হইলেও ভক্তানুগ্রহার্থ তাঁহার শরীর গ্রহণ অসম্ভব নহে।

মীমাংসকেরা এসকল কথার উত্তর দিয়াছেন, কিন্তু তাহার বিবরণ লিখিতে গেলে প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ এবং কটমট হইয়া উঠে। ফলে বেদ মানিব কেন? এই তর্কের তিনটী মাত্র উত্তর, প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়—

প্রথম বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়, সুতরাং ইহা মান্য। কিন্তু বেদেই আছে, যে ইহা অপৌরুষেয় নহে। যথা “ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে” ইত্যাদি।

দ্বিতীয়। বেদ ঈশ্বরপ্রণীত এইজন্য মান্য। প্রতিবাদীরা বলিবেন যে, বেদ যে ঈশ্বরপ্রণীত তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। বেদে আছে, বেদ ঈশ্বরসম্ভূত, কিন্তু যে খানে তাঁহারা বেদ মানিতেছেন না তখন তাঁহারা বেদের কোন কথা মানিবেন না। এবিষয়ে যে বাদানুবাদ হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়, এবং তাহা সবিস্তারে লিখিবার আবশ্যকতা

নাই। যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না, তাঁহারা বেদ ঈশ্বরপ্রীত বলিয়া যে স্বীকার করিবেন না, তাহা বলা বাহুল্য।

তৃতীয় বেদের নিজ শক্তির অভিব্যক্তির দ্বারাই বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতেছে। সাংখ্যকার এই উত্তর দিয়াছেন। সায়নাচার্য্য বেদার্থ প্রকাশে, এবং শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে ঐরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কেবল ইহাই বক্তব্য যে যদি বেদের এরূপ শক্তি থাকে, তবে বেদ অবশ্য মান্য। কিন্তু সে শক্তি আছে কি না, এই এক স্বতন্ত্র বিচার আবশ্যক হইতেছে। অনেকে বলিবেন যে আমরা এরূপ শক্তি দেখিতেছি না। বেদের অগৌরব হিন্দুশাস্ত্রেও আছে। বেদ মানিতে হইবে কি না, তাহা সকলেই আপনাপন বিবেচনামত মীমাংসা করিবেন, কিন্তু আমরা পক্ষপাতশূন্য হইয়া যেখানে লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং যখন বেদের গৌরব নির্ব্বাচনাত্মক তত্ত্ব লিখিয়াছি, তখন হিন্দুশাস্ত্রে কোথায় কোথায় বেদের অগৌরব আছে তাহাও আমাদিগকে নির্দ্দেশ করিতে হয়।

১। মুণ্ডকোপনিষদের আরম্ভে "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরাচ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্প ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষয়মধিগম্যতে।"

অর্থাৎ বেদাদি শ্রেষ্ঠেতর বিদ্যা।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, ২।৪২, বেদপরায়ণদিগের নিন্দা আছে, যথা

যমিমাং পুষ্পিতাং বাচম্প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মনঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্ম ফলপ্রদম্।

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য গতিং প্রতি।
ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।
ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন॥

৩। ভাগবত পুরাণে নারদ বলিতেছেন যে পরমেশ্বর যাহাকে অনুগ্রহ করেন সে বেদ ত্যাগ করে। ৪।২৯, ৪২।

শব্দব্রহ্মণি দুষ্পারে চরন্ত উরুবিস্তরে।
মন্ত্রলিঙ্গ ব্যবচ্ছিন্নং ভজন্তো ন বিদুঃ পরম্॥
যদা যস্যানুগৃহ্নাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতম্॥

৪। কঠোপনিষদে আছে যে বেদের দ্বারা আত্মা লভ্য হয় না,—যথা

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"

শাস্ত্রানুসন্ধান করিলে এরূপ কথা আরও পাওয়া যায়। পাঠক দেখিবেন, বেদ মানিব কেন? এ প্রশ্নের আমরা কোন উত্তর দিই নাই। দিবারও আমাদের ইচ্ছা নাই। যাঁহারা সক্ষম তাঁহারা সে মীমাংসা করিবেন। আমরা পূর্ব্বগামী পণ্ডিত-দিগেরপ্রদর্শিত পথে পরিভ্রমণ, করিয়া যাহা দেখিয়াছি, তাহাই পাঠকের নিকট নিবেদিত হইল।*



* এই প্রবন্ধে বেদ পুরাণাদি হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা মুর সাহেব কৃত বিখ্যাত সংগ্রহ হইতে নীত হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মের নৈসর্গিক মূল।

নব্য বাঙ্গালি সম্প্রদায় প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মকে উপধর্ম্ম পরিপূর্ণ এক বিষময় ফলের আধার স্বরূপ জানেন। যে পূর্ব্বপুরুষগণ ইহার উদ্ভাবন এবং সংস্করণ করিয়াছিলেন, এবং যাঁহারা ইহাতে বিশ্বাস করেন তাঁহাদিগকে আমরা ঘোরতর মূর্খ মনে করি। এদিকে আবার সেই পূর্ব্বপুরুষগণের প্রণীত কাব্য ও দর্শনাদি দেখিয়া তাঁহাদিগকে মহাত্মা মনে করি। এরূপ মাহাত্ম্য এবং মূর্খতা কি প্রকারে একত্র সংযুক্ত হইল, এ প্রশ্ন একবারও আমাদের মনে উদয় হয় না। বাস্তবিক পৌরাণিক ধর্ম্মে বিশ্বাস কি এরূপ ঘোরতর মূর্খতা? যাহা তিন সহস্র বৎসর অবাধে কোটি কোটি মনুষ্যের ভক্তির বিষয় হইয়া আসিতেছে, সর্ব্ববিজয়ী ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্ম্ম যাহার তেজোহ্রাস করিতে সমর্থ হয় নাই, সর্ব্ববিজয়ী বৌদ্ধধর্ম্ম যাহার নিকট পরাভূত হইল, তাহা কি কেবল মূর্খতার ফল? তাহার কি কোন নৈসর্গিক ভিত্তি নাই? না থাকিলে এত বল হইবে কেন?

সেই নৈসর্গিক ভিত্তির আমরা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু পূর্ব্বকালে এই ভিত্তি যে আকারে আর্য্যগণের চক্ষে দীপ্যমান হইয়াছিল, আমরা তাহা আর খুঁজিয়া পাইব না। তাঁহারা কি প্রকারে চিন্তা করিতেন, কি প্রণালীতে বিচার করিতেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। আমরা যাহা অনেক অনুসন্ধান করিয়া, অনেক বিচার করিয়া স্থির করি, তাঁহারা হয় ত তাহা কেবল অভ্যন্তরিক দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেন। আমরা সে পথে যাইব না—গেলে কিছু বুঝিতে পারিব না—কিছু বুঝাইতে পারিব না। এখন কোন তত্ত্বের নৈসর্গিক ভিত্তি বুঝাইতে

গেলে, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের আলোকে তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হইবে। নহিলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে কেহ বুঝিবে না। আমরা এ বিচারে এক জন ইউরোপীয় দার্শনিক এবং একজন ইউ-রোপীয় বিজ্ঞানবিদের আশ্রয় গ্রহণ করিব। মিল ও ডার্ব্বিন আমাদিগকে পথ দেখাইয়াদিবেন।

প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের শিরোভাগ এই যে, ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনটী পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তিতে তিনি বিভক্ত। এক সৃজন করেন, এক পালন করেন, এবং এক ধ্বংস করেন। এই ত্রিদেব লোকপ্রথিত।

জনষ্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যুর পর, ধর্ম্মসম্বন্ধে তৎপ্রণীত তিনটী প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়াছে। তাহার একটীর উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের অস্তিত্বের মীমাংসা করা। মিলের মত, যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ ঈশ্বরবাদীরা প্রয়োগ করেন, তাহার মধ্যে একটীই সারবান্। জগতের নির্ম্মাণকৌশল হইতে তাঁহার মতে, নির্ম্মাতার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। এটী প্রাচীন কথা এবং অখণ্ডনীয়ও নহে। ডার্বিনের মতপ্রচারের পূর্ব্বেও ইহার সদুত্তর ছিল; এক্ষণে ডার্বিন দেখাইয়াছেন, যে এই নির্ম্মাণ-কৌশল স্বতঃই ঘটে। মিলও ডার্বিনের এই মত অনবগত ছিলেন এমত নহে; তিনি স্বীয় প্রবন্ধমধ্যে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে যদি এই মতটি প্রকৃত হয় তবে উপরি কথিত নির্ম্মাণকৌশল ঈশ্বরের অস্তিত্বপ্রতিপাদক হয় না। কিন্তু ডার্বিনের মতপ্রচারের অল্পকাল পরেই মিলের প্রস্তাব লিখিত হয়। সে মতের সত্যাসত্য পরীক্ষিত এবং নির্ব্বাচিত হওয়ার পক্ষে কালবিলম্বের প্রয়োজন। কালবিল-ম্বের সে ফল তিনি পান নাই। অতএব তিনি এই মতের উপর দৃঢ়রূপে নির্ভর করিতে পারেন নাই। নির্ভর করিতে পারিলে

তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইত যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণ নাই।

এখনও অনেকে ডার্বিনের প্রতিবাদী আছেন—কিন্তু বহুতর পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক তাঁহার মত আদৃত এবং স্বীকৃত। অধিকাংশ বিজ্ঞানবিদ্ এবং দর্শনবিদ্ পণ্ডিতেরা এক্ষণে ডার্বিনের মতাবলম্বী। কিন্তু ডার্বিনের মত প্রকৃত হইলেও ঈশ্বর নাই, এ কথা সিদ্ধ হইল না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণাভাব ঈশ্বরের অনস্তিত্বের প্রমাণ নহে। কোন পদার্থের অস্তিত্বের প্রমাণাভাবে তাহার অনস্তিত্ব প্রমাণ হইবে, যদি বিচারের এরূপ নিয়ম সংস্থাপন করা যায়, তাহা হইলে অনেক স্থানে প্রমাদ ঘটে। ঈশ্বর আছেন এ কথা সত্য হউক না হউক কথা অসঙ্গত কেহ বলিতে পারিবেন না। প্রায় এই রূপ ভাবেই মিল ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। ডার্বিন স্বয়ং স্পষ্টতঃ ঈশ্বর স্বীকার করেন। অতএব প্রমাণ থাক বা না থাক্ ঈশ্বর স্বীকার করা যাউক। কিন্তু যদি ঈশ্বর আছেন, তবে তাঁহার প্রকৃতি কি প্রকার? এ বিষয়ে একটী প্রভেদ এস্থলে স্পষ্টীকরণ আবশ্যক। কতকগুলি ঈশ্বরবাদী আছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও তৎপ্রতি স্রষ্টা বিধাতা ইত্যাদি পদ ব্যবহার করেন না। অন্যে বলেন, ঈশ্বর ইচ্ছা প্রবৃত্ত্যাদি বিশিষ্ট—এই জগতের নির্ম্মাতা, ইচ্ছাক্রমে এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। উপরি কথিত দার্শনিকেরা বলেন, আমরা সে সকল কথা জানি না, জানিবার উপায়ও নাই; ইহাতে কেবল জানি, যে সেই জগৎকারণ অজ্ঞেয়। হর্বটস্পেন্সর এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্র।* তাঁহার দর্শনে ঈশ্বর জগদ্ব্যাপক জ্ঞানাতীত শক্তি মাত্র।

* The consciousness of an Inscrutable Power

মিল যে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, তিনি এরূপ অজ্ঞেয় নহেন। মিল ইচ্ছাবিশিষ্ট, জগন্নির্ম্মাতা স্বীকার করিয়াছেন। স্বীকার করিয়া ঐশিক স্বভাবের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঈশ্বরবাদীরা সচরাচর ঈশ্বরের তিনটী গুণ বিশেষ রূপে নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন—শক্তি, জ্ঞান এবং দয়া। তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বরের গুণমাত্র সীমাশূন্য—অনন্ত। অতএব ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান, এবং দয়াও অনন্ত। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, এবং দয়াময়।

মিল এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে যেখানে জগতের নির্ম্মাণকৌশল দেখিয়াই আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছি, সেই খানেই তাঁহার শক্তি যে অনন্ত নহে তাহা স্বীকৃত হইতেছে। কেননা যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহার কৌশলের প্রয়োজন কি? কৌশল কোথায় প্রয়োজন হয়? যেখানে কৌশল ব্যতীত ইষ্টসিদ্ধি হয় না, সেখানেই কৌশল প্রয়োজন হয়—যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, ইচ্ছায় সকলই করিতে পারেন, তাঁহার কৌশলের প্রয়োজন হয় না। কেবল ইচ্ছা বা আজ্ঞামাত্রে কৌশলের উদ্দেশ্য কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে। যদি মনুষ্যের এরূপ শক্তি থাকিত যে, সে কেবল ঘড়ির ডায়ল প্লেটের উপর কাঁটা বসাইয়া দিলেই কাঁটা নিয়মমত চলিত তবে কখন মনুষ্য কৌশলাবলম্বন করিয়া ঘড়ির স্প্রিঙ্গের উপর স্প্রিঙ্গ এবং হুইলের উপর হুইল গড়িত না। অতএব ঈশ্বর যে সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, ইহা সিদ্ধ।

একথার দুই একটা উত্তর আছে কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তির অনুসন্ধান আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, অতএব সে সকল

manifested to us through all phenomena has been growing ever clearer.—*First Principles*. p. 108.

কথা আমরা ছাড়িয়া যাইতে পারি। সে সকল আপত্তিও মিল সম্যক্ প্রকারে খণ্ডন করিয়াছেন।

সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে মিল বলেন, যে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ। যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া মনুষ্যের কৃত কৌশলের বিচার করা যায়, সে প্রণালী অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরকৃত কৌশল সকলের [illegible] করিলে অনেক দোষ বাহির হয়। এই মনুষ্যদেহের নির্ম্মাণে কত কৌশল, কত শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে, কত যত্নে তাহা রক্ষিত হইয়া থাকে! কিন্তু যাহাতে এত কৌশল, এত শক্তিব্যয়, এত যত্ন, তাহা ক্ষণভঙ্গুর—কখন অধিক কাল থাকে না। যিনি এত কৌশল করিয়া ক্ষণভঙ্গুরতা বারণ করিতে পারেন নাই, তিনি সকল কৌশল জানেন না—সর্ব্বজ্ঞ নহেন। দেখ, জীবশরীর কোন স্থানে ছিন্ন হইলে, তাহা পুনঃ সংযুক্ত হইবার কৌশল আছে; উহাতে বেদনা হয়, পূঁজ হয়, এবং সেই ব্যাধির ফলে পুনঃসংযোগ ঘটে। কিন্তু সেই ব্যাধি পীড়াদায়ক। যাঁহার প্রণীত কৌশল, উপকারার্থ প্রণীত হইয়াও পীড়াদায়ক, তাঁহার কৌশলে অসম্পূর্ণতা আছে। যাঁহার কৌশলে অসম্পূর্ণতা আছে, তাঁহাকে কখন সর্ব্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে না।

ইহাও মিল স্বীকার করেন যে এমতও হইতে পারে, যে এই অসম্পূর্ণতা শক্তির অভাবের ফল—অসর্ব্বজ্ঞতার ফল নহে। অতএব ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইলেও হইতে পারেন।

যদি ইহাই বিশ্বাস কর, যে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, তবে এক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যে কে ঈশ্বরের শক্তির প্রতিবন্ধকতা করে? মনুষ্যাদি যে সর্ব্বশক্তিমান্ নহে, তাহার কারণ তাহাদিগের শক্তির প্রতিবন্ধক আছে। তুমি যে হিমালয় পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া সাগরপারে নিক্ষেপ করিতে পার না

—তাহার কারণ মাধ্যাকর্ষণ তোমার শক্তির প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। শক্তির প্রতিবন্ধক না থাকিলে, সকলেই সর্ব্বশক্তিমান্ হইত। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, এই কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে,যে তাঁহার শক্তির প্রতিবন্ধক কেহ বা কিছু আছে। সেই প্রতিবন্ধক কি? কোন্ বিঘ্নের জন্য সর্ব্বজ্ঞ তাঁহার অভিপ্রেত কৌশল নির্দ্দোষ করিতে পারেন নাই?

এই সম্বন্ধে দুইটি উত্তর হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন যে, দেখ, ঈশ্বর নির্ম্মাতা মাত্র, তিনি যে স্রষ্টা এমত প্রমাণ তুমি কিছু পাও নাই। তুমি তাঁহার নির্ম্মাণ প্রণালী দেখিয়াই তাঁহার অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতেছ: কিন্তু নির্ম্মাণ প্রণালী হইতে কেবল নির্ম্মাতাই সিদ্ধ হইতে পারেন, স্রষ্টা সিদ্ধ হইতে পারেন না। ঘটের নির্ম্মাণ দেখিয়া তুমি কুম্ভকারের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতে পার; কিন্তু কুম্ভকারকে মৃত্তিকার সৃষ্টিকারক বলিয়া তুমি সিদ্ধ করিতে পার না। অতএব এমন হইতে পারে যে ঈশ্বর স্রষ্টা নহেন; কেবল নির্ম্মাতা। ইহার অর্থ এই যে যে সামগ্রীকে গঠন দিয়া তিনি বর্ত্তমানাবস্থাপন্ন করিয়াছেন, সে সামগ্রী পূর্ব্ব হইতে ছিল—ঈশ্বরের সৃষ্ট নহে। ঘট দেখিয়া কেবল ইহাই সিদ্ধ হয় যে কোন কুম্ভকার মৃত্তিকা লইয়া ঘট নির্ম্মাণ করিয়াছে। মৃত্তিকা তাহার পূর্ব্ব হইতে ছিল, কুম্ভকারের সৃষ্ট নহে, এ কথা বলা বিচারসঙ্গত হইবে। সেই অসৃষ্ট সামগ্রীই বোধ হয় ঐশীশক্তির সীমা নির্দ্দেশক—তাঁহার শক্তির প্রতিবন্ধক। সেই জাগতিক জড়পদার্থের এমন কোন দোষ আছে, যে তজ্জন্য উহা ঈশ্বরেরও সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত নহে। সেই কারণে বহু কৌশলময় এবং বহু শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরও আপনকৃত কার্য্য সকল সম্পূর্ণ এবং দোষশূন্য করিতে পারেন নাই।

আর একটি উত্তর এই যে ঈশ্বরবিরোধী দ্বিতীয় কোন চৈতন্যই তাঁহার শক্তির প্রতিবন্ধক। যদি নির্ম্মাতার কার্য্য দেখিয়া নির্ম্মাতাকে সিদ্ধ করিলে, তবে তাঁহার কার্য্যের প্রতিবন্ধকতার চিহ্ন দেখিয়াও প্রতিকূলাচারী চৈতন্যেরও কল্পনা করিতে পার। পারসিকদিগের প্রাচীন দ্বৈতধর্ম্ম এইরূপ—তাঁহারা বলেন যে একজন ঈশ্বর জগতের মঙ্গলে নিযুক্ত—আর এক ঈশ্বর জগতের অমঙ্গলে নিযুক্ত। খ্রীষ্টধর্ম্মে ঈশ্বর ও সয়তানে এই দ্বৈত মত পরিণত।

ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে মিল প্রথমোক্ত মতটি অবলম্বন করারই কারণ দর্শাইয়াছেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বপ্রণীত "প্রকৃতিতত্ত্ব" সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তিনি দ্বিতীয় মতের পৃষ্ঠরক্ষা করিয়াছেন। সংসার যে অনিষ্টময়, তাহা কোন মনুষ্যকে কষ্ট করিয়া বুঝাইবার কথা নহে—সকলেই অবিরত দুঃখভোগ করিতেছেন—এবং পরের দুঃখভোগ দেখিতেছেন। জীবের কার্য্য মাত্রই কেবল দুঃখমোচনের চেষ্টা। যিনি কেবল জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তৎকর্ত্তৃক এরূপ দুঃখময় সংসার সৃষ্ট হওয়া অসম্ভব। এ সম্বন্ধে কথিত প্রবন্ধ হইতে কয়েক পংক্তির মর্ম্মানুবাদ করিতেছি। মিল বলেন—

"যদি এমন হয়, যে ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন, তবে জীবের দুঃখ যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত, এ সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার নাই।* যাঁহারা মনুষ্য প্রতি ঈশ্বরের

* তৎসম্বন্ধে মিলের কয়েকটি কথা ইংরেজিতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"Next to the greatness of these Cosmic Forces, the quality which most forcibly strikes every one who does not avert his eyes from it is their perfect and absolute recklessness. They go straight to their end, without regarding what and whom they crush

আচরণের পক্ষ সমর্থন করিতে আপনাদিগকে যোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা মতবৈপরীত্যশূন্য,

on the road.........In sober truth, nearly all things for which men are hanged or imprisoned for doing to one another are nature's every day performances. Killing, the most criminal act recognished by human laws, Nature does once to every being that lives; and in a large proportion of cases, after protracted tortures such as only the greatest monster whom we read of ever purposoly inflicted on their living fellow creatures. If by an arbitrary reservation we refuse to account any thing murder but what abridges a certain term supposed to bo allotted to human life, nature dose also this to all but a small precentage of lives, and dose it in all the modes, violent or insidiousiu which the worst human beings take the lives of one another. Nature impales men, breaks them as if on the wheel, casts them te be devoured by wild beasts, burns them to death, crushes them with stones like the first Christian Martyr, starves them with hunger, freezes, them with cold, poisons them by the quick or slow venom of ner exhalations, and has hundreds of other hideous deaths such as the ingenious cruelty of a Nabis or a Domitian never surpassed. All this Nature does with the most supercilious disregard both of mercy and of justice, emptying her shafts upon the best and noblest indifferently with the meanest and worst: upon those who are engaged in the highest and worthiest enterprises, and often as the direct consquence of the noblest acts, and it might almost be imagined as a punishment for them. She mows down those on whose existence hangs the weK being of a whole people, perhaps of the prospects of the human race for generations to come, with as little compunction as those whose death is a relief to themselves and to those under their noxious influence. Such are nature's dealings with life. Even when she does not intend to kill, she inflicts the same tortures in apparent wantonuess. In the clumsy provision which she has made for that per-

তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য, হৃদয়কে কঠিন ভাবাপন্ন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, দুঃখ অশুভ নহে। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বরকে দয়াময় বলায় এমত বুঝায় না যে মনুষ্যের সুখ তাঁহার অভিপ্রেত; তাহাতে বুঝায় যে মনুষ্যের ধর্ম্মই তাঁহার অভিপ্রেত; সংসার সুখের হউক আর না হউক, ধর্ম্মের সংসার বটে। এইরূপ ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, তাহা পরিত্যাগ করিয়াও ইহা বলা যাইতে পারে যে স্থূল কথার মীমাংসা ইহাতে কই হইল? মনুষ্যের সুখ, সৃষ্টিকর্ত্তার যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সে

---

petual renewal of animal life, rendered necessary by the prompt termination she puts to it in every individual instance, no human being ever comes into the world but another human being is literally stretched on the rack for hours or days, not unfrequently issuing in death. Next to taking life, equal to it according to a high authority, is takiug the means by which we live, and nature does this too on the largest scale, and with the most callous indifference. A single hurricane destroys the hopes of a season, a flight of locusts or an inundation desolates a district; a trifling chemical change in an edible root starves a million of people. The waves of the sea, like banditti seize and appropriate the wealth of the rich and the little all of the poor with the same accompaniments of stripping, wounding. and killing as their human prototypes. Every thing in short which the worst men commit either against life or property is perpetrated on a larger seale by natural agents. Nature has Noyades more fatal than those of Carrier, her explosions of fire damp are as destructive as human artillery, her plague and cholera far surpass the poison cups of the Borgias......Anarchy and the Reign of Terror are overmatched in injustice, ruin, and death by a hurricane and a pestilence.—*Mill on Nature.* p. p. 28 31.

উদ্দেশ্য যেমন সম্পূর্ণরূপে বিফলীকৃত হইয়াছে, মনুষ্যের ধর্ম্ম তাঁহার যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে সে উদ্দেশ্যও সেইরূপ সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। [illegible] লোকের সুখের পক্ষে যেরূপ অনুপযোগী, লোকের ধর্ম্মের পক্ষে বরং তদধিক অনুপযোগী। যদি সৃষ্টির নিয়ম ন্যায়মূলক হইত, এবং সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান্ হইতেন, তবে সংসারে যেটুকু সুখ দুঃখ আছে, তাহা ব্যক্তি-বিশেষের ভাগ্যে তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্মের তারতম্য অনুসারে পড়িত; কেহ অন্যাপেক্ষা অধিকতর দুষ্ক্রিয়াকারী না হইলে অধিকতর দুঃখভাগী হইত না; অকারণ ভালমন্দ বা অন্যায়ানুগ্রহ সংসারে স্থান পাইত না; সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নৈতিক উপাখ্যানবৎ গঠিত নাটকের অভিনয় তুল্য মনুষ্যজীবন অতিবাহিত হইত। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তাহা যে উপরিকথিত রীতিযুক্ত নহে, এ বিষয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না; এবং এইরূপ, ইহলোকে যে ধর্ম্মাধর্ম্মের সমুচিত ফল বাকি থাকে, লোকান্তরে তাহার পরিশোধন আবশ্যক, পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইহাই গুরুতর প্রমাণ বলিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এরূপ প্রমাণ প্রয়োগ করায় অবশ্য স্বীকৃত হয়, যে ইহজগতের পদ্ধতি অবিচারের পদ্ধতি, সদ্বিচারের পদ্ধতি নহে। যদি বল যে ঈশ্বরের কাছে সুখ দুঃখ এমন গণনীয় নহে যে তিনি তাহা পুণ্যাত্মার পুরস্কার এবং পাপাত্মার দণ্ড বলিয়া ব্যবহার করেন, বরং ধর্ম্মই পরমার্থ এবং অধর্ম্মই পরম অনর্থ, তাহা হইলেও নিতান্ত পক্ষে এই ধর্ম্মাধর্ম্ম যাহার যেমন কর্ম্ম তাহাকে সেই পরিমাণে দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। তাহা না হইয়া কেবল জন্মদোষেই* বহুলোকে সর্ব্বপ্রকার পাপাশক্ত হয়;

* খ্রীষ্টান ইউরোপে এ কথার উত্তর নাই। পুনর্জ্জন্মবাদী হিন্দুর হাতে মিল তত সহজে নিস্তার পাইতেন না।

তাহাদিগের পিতৃমাতৃদোষে, সমাজের দোষে, নানা অলজ্ঘ্য ঘটনার দোষে, এরূপ হয়;—তাহাদের নিজদোষে নহে। ধর্ম্মপ্রচারক বা দার্শনিকদিগের ধর্ম্মোন্মাদে শুভাশুভ সম্বন্ধে যে কোন প্রকার সঙ্কীর্ণ বা বিকৃত মত প্রচার হইয়া থাকুক না কেন, কোন প্রকার মতানুসারেই প্রাকৃতিক শাসনপ্রণালী দয়াবান্ ও সর্ব্বশক্তিমানের কৃত কার্য্যানুরূপ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারিবে না।"*

এই সকল কথা বলিয়া মিল যাহা বলিয়াছেন, তাহার এমত অর্থ করা যায়, যে এই জগতের নির্ম্মাতা বা পালনকর্ত্তা হইতে পৃথক্ শক্তির দ্বারা জীবের ধ্বংস বা অনিষ্ট সম্পন্ন হইতেছে। এরূপ মত সুসঙ্গত। মিল, এরূপ মত, ইঙ্গিতেও ব্যক্ত করিয়াছেন কি না, তাহা তাঁহার জীবনচরিত্র যে না পড়িয়াছে, তাহার সংশয় হইতে পারে। এজন্য ইংরেজি হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

"The only admissible moral theory of Creation is that the principle of good *cannot* at once and altogether subdue the powers of evil, either physical or moral: could not place mankind in a world free from the necessity of an incessant struggle with the maleficent powers, or make them victorious in that struggle, but could and did make them capable of carrying on the fight with vigour and with progressively increasing success. Of all the religions explanations of the order of nature, this alone is neither contradictory to itself, nor to the facts for which it attempts to account."†

---

* *Mill on Nature* pp. 37-38.

† *Mill on Nature*—pp. 38-39.

যদি এ কথার কোন অর্থ থাকে, তবে সে অর্থ এই যে, জগতের পালনকর্ত্তা, এবং সংহারকর্ত্তা স্বতন্ত্র, এমত কথা অসঙ্গত নহে। ইহার উপর যদি একজন পৃথক্ সৃষ্টিকর্ত্তা পাওয়া যায়, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তি পাওয়া গেল।

মিলে তাহা পাওয়া যাইবে না, মিল হিন্দু নহেন, হিন্দুর পক্ষসমর্থন জন্য লিখেন নাই। তিনি নির্ম্মাণকৌশল হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন, নির্ম্মাতা ভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা মানেন না। কিন্তু বিজ্ঞানে বলে, জীবের জন্ম নির্ম্মাণ মাত্র; ভৌতিক পদার্থের সমবায়বিশেষ জীবত্ব। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু দেখি—জীব উদ্ভিদ্ বায়ু বারি মৃৎপ্রস্তরাদি, সকলই সেইরূপে নির্ম্মিত, পৃথিবীও তাই; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু নক্ষত্র, নীহারিকা, সকলই নির্ম্মিত। অতএব সকলই সেই নির্ম্মাতার কীর্ত্তি—তাঁহার হস্তপ্রসূত। সচরাচর সৃষ্টিকর্ত্তা যাঁহাকে বলা যায়, ঈদৃশ নির্ম্মাতার সঙ্গে তাঁহার প্রভেদ অল্প। যে আকার শূন্য, শক্তিবিশিষ্ট, পরমাণু সমষ্টিতে এই বিশ্ব গঠিত তাহা নির্ম্মিত কি না—নির্ম্মাতার হস্তপ্রসূত কি না—তাহার কেহ স্রষ্টা আছেন কি না, তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব। এই টুকু স্মরণ রাখিয়া, সৃষ্টিকর্ত্তা শব্দের প্রচলিত অর্থে নির্ম্মাতাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যাইতে পারে। তাহা হউক বা না হউক, ঈদৃশ স্রষ্টার সঙ্গেই ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের নিকট সম্বন্ধ। অতএব তাঁহাকে পাইলেই আমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল।

মিল বলেন, তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণীকৃত। তবে মিল, নির্ম্মাতা এবং পালন বা রক্ষাকর্ত্তার মধ্যে প্রভেদ করেন না। ইউরোপে, কেহ এরূপ প্রভেদ স্বীকার করে না। এরূপ স্বীকার না করিবার কারণ ইহাই দেখা যায়, যে জন্মও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল, রক্ষাও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল; যে নিয়মাবলীর

ফল জন্ম বা সৃজন, সেই সেই নিয়মাবলীর ফল রক্ষা। অতএব যিনি জন্ম, নির্ম্মাণ, বা সৃষ্টির নিয়ন্তা, তিনিই রক্ষা বা পালনেরও নিয়ন্তা ইহা সিদ্ধ।

কিন্তু ধ্বংস সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। রক্ষাও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল; সংহারও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল। যে সকল নিয়মের ফল রক্ষা, সেই সকল নিয়মেরই ফল ধ্বংস। যে রাসায়নিক সংযোজন বিশ্লেষণে জীবের দেহ রক্ষিত হয়, সেই রাসায়নিক সংযোজন বিশ্লেষণেই জীবের দেহ লয়প্রাপ্ত হয়। যে অম্লজনের সংযোগে জীবের দেহ প্রত্যহ গঠিত ও ও পরিপুষ্ট হইতেছে—শেষ দিনে সেই অম্লজন সংযোগেই তাহা নষ্ট হইবে। অতএব যিনি পালনের নিয়ন্তা, তিনিই যে সংহারের নিয়ন্তা ইহাও সিদ্ধ।

তবে পালনকর্ত্তা চৈতন্য সংহারকর্ত্তা চৈতন্য পৃথক্, এ রূপ বিবেচনা অসঙ্গত নহে, এ কথা বলিবার কারণ কি? কারণ এই, যে যিনি পালনকর্ত্তা, তাঁহার অভিপ্রায় যে জীবের মঙ্গল, জগতে ইহার বহুতর প্রমাণ দেখা যায়। কিন্তু মঙ্গল তাঁহার অভিপ্রেত হইলেও অমঙ্গলেরই আধিক্য দেখা যায়। যাঁহার অভিপ্রায় মঙ্গলসিদ্ধি, তিনি আপনার অভিপ্রায়ের প্রতিকূলতা করিয়া অমঙ্গলের আধিক্যই সিদ্ধ করিবেন, ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। এই জন্য সংহার যে পৃথক্ চৈতন্যের অভিপ্রায় বা অধিকার, এ কথা অসঙ্গত নহে বলা হইয়াছে।

তবে এরূপ মতের স্থূল কারণ, পালনে ও ধ্বংসে দৃশ্যমান অসঙ্গতি। সৃজন ও পালনে যদি এইরূপ অভিপ্রায়ের অসঙ্গতি দেখা যায়, তবে স্রষ্টা ও পাতা পৃথক্, এরূপ মতও অসঙ্গত বোধ হইবে না।

• সৃজনে ও পালনে এরূপ অসঙ্গতি আধুনিক ইউরোপায়

বিজ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে। নহিলে ডার্বিনের "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" প্ররিত্যাগ করিতে হয়। যে মতকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বলে, তাহার মূলে এই কথা আছে, যে, যে পরিমাণে জীব সৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে কখন রক্ষিত বা পালিত হইতে পারে না। জীবকুল অত্যন্ত বৃদ্ধিশীল—কিন্তু পৃথিবী সঙ্কীর্ণা। সকলে রক্ষিত হইলে, পৃথিবীতে স্থান কুলাইত না, পৃথিবীতে উৎপন্ন আহারে তাহাদের পরিপোষণ হইত না। অতএব অনেকেই জন্মিয়াই বিনষ্ট হয়—অধিকাংশ অণ্ডমধ্যে বা বীজে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যাহাদিগের বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিক প্রকৃতিতে এমন কিছু বৈলক্ষণ্য আছে, যে তদ্দ্বারা তাহারা সমানাবস্থাপন্ন জীবগণ হইতে আহার সংগ্রহে, কিম্বা অন্য প্রকারে জীবনরক্ষায় পটু, তাহারাই রক্ষাপ্রাপ্ত হইবে, অন্য সকলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। মনে কর যদি কোন দেশে বহু জাতীয় এরূপ চতুষ্পদ থাকে যে তাহারা বৃক্ষের শাখা ভোজন করিয়া জীবনধারণ করে, তাহা হইলে যাহাদিগের গলদেশ ক্ষুদ্র, তাহারা কেবল সর্ব্বনিম্নস্থ শাখাই ভোজন করিতে পাইবে, যাহাদের গলদেশ দীর্ঘ তাহারা নিম্নস্থ শাখাও খাইবে তদপেক্ষা ঊর্দ্ধস্থ শাখাও খাইতে পারিবে। সুতরাং যখন খাদ্যের টানাটানি হইবে—সর্ব্বনিম্নস্থ শাখা সকল ফুরাইয়া যাইবে, তখন কেবল দীর্ঘস্কন্ধরাই আহার পাইবে—হ্রস্বস্কন্ধরা অনাহারে মরিয়া যাইবে বা লুপ্তবংশ হইবে। ইহাকেই বলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। দীর্ঘস্কন্ধেরা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে রক্ষিত হইল। হ্রস্বস্কন্ধের বংশলোপ হইল।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের মূল ভিত্তি এই যে যত জীব সৃষ্ট হয়, তত জীব কদাচ রক্ষা হইতে পারে না। পারিলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রয়োজনই হইত না। দেখ একটি সামান্য বৃক্ষে

কত সহস্র সহস্র বীজ জন্মে; একটি ক্ষুদ্র কীট, কত শত শত অণ্ড প্রসব করে। যদি সেই বীজ, বা সেই অণ্ড, সকল গুলিই রক্ষিত হয়, তবে অতি অল্পকালমধ্যে সেই এক বৃক্ষেই, বা সেই একটী কীটেই পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়, অন্য বৃক্ষ বা অন্য জীবের স্থান হয় না। যদি কোন কীট প্রত্যহ দুইটী অণ্ড প্রসব করে, (ইহা অন্যায় কথা নহে) তবে দুই দিনে সেই কীট-সন্তান হইতে চারিটি, তিন দিনে আটটি, চারি দিনে, ষোলটি, দশ দিনে সহস্রাধিক, এবং বিশ দিনে দশ লক্ষের অধিক কীট জন্মিবে। এক বৎসরে কত কীট হইবে তাহা শুভঙ্কর হিসাব করিয়া উঠিতে পারেন না। মনুষ্যের বহুকাল বিলম্বে এক একটি সন্তান হয়, এক দম্পতি হইতে চারি পাঁচটি সন্তানের অধিক সচরাচর হয় না; অনেকেই মরিয়া যায়; তথাপি এমন দেখা গিয়াছে যে, কোন প্রদেশে পঁচিশ বৎসরে মনুষ্যসংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। যদি সর্ব্বত্র এইরূপ বৃদ্ধি হয় তবে, হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, সহস্র বৎসর মধ্যে পৃথিবীতে মনুষ্যের দাঁড়াইবার স্থান হইবে না। হস্তীর অপেক্ষা অল্পপ্রসবী কোন জীবই নহে, মনুষ্যও নহে কিন্তু ডার্বিন হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে অতি ন্যূনকল্পেও এক হস্তিদম্পতি হইতে ৭৫০ বৎসর মধ্যে এক কোটি নবতি লক্ষ হস্তী সম্ভূত হইবে। এমন কোন বর্ষজীবী বৃক্ষ নাই যে তাহা হইতে বৎসরে দুইটী মাত্র বীজ জন্মে না। লিনিয়স হিসাব করিয়াছেন যে, যে বৃক্ষে বৎসরে দুইটী মাত্র বীজ জন্মে, সকল বীজ রক্ষা পাইলে, তাহা হইতে বিংশতি বৎসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ হইবে।*

এক্ষণে পাঠক ভাবিয়া দেখুন একটি বার্ত্তাকু বৃক্ষে কতগুলি বার্ত্তাকু—পরে ভাবুন বার্ত্তাকুতে কতগুলি বীজ থাকে। তাহা

* *Origin of Spicies—6th* ***Edition.*** **p. 51.**

হইলে একটি বার্ত্তাকু বৃক্ষে কত অসংখ্য বীজ জন্মে তাহা স্থির করিবেন। সকল বীজ রক্ষা হইলে, যেখানে বার্ষিক দুইটী বীজ হইতে বিংশতি বৎসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ হয়, সেখানে বৎসর বৎসর প্রতি বৃক্ষের সহস্র সহস্র বার্ত্তাকু বীজে বিংশতি বৎসরে কত কোটি কোটি কোটি বার্ত্তাকুবৃক্ষ হইবে,তাহা কে মনে ধারণা করিতে পারে? সকল বীজ রক্ষা পাইলে, কয় বৎসর পৃথিবীতে বার্ত্তাকুর স্থান হয়?

চেতন সম্বন্ধেও ঐরূপ। যে পরিমাণে সৃষ্টি, তাহার সহস্রাংশ রক্ষিত হয় না। যদি স্রষ্টা এবং পালনকর্ত্তা এক, তবে তিনি যাহার পালনে অশক্ত তাহা এত প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টি করেন কেন? জীবের রক্ষা যাঁহার অভিপ্রায়, তিনি অরক্ষণীয়ের সৃষ্টি করেন কেন? ইহাতে কি অভিপ্রায়ের অসঙ্গতি দেখা যায় না? ইহাতে কি এমত বোধ হয় না, যে স্রষ্টা ও পাতা এক, এ কথা না বলিয়া, স্রষ্টা পৃথক্ পাতা পৃথক্ এ কথা বলাই সঙ্গত?

ইহার একটি উত্তর আছে—জীবধ্বংসের জন্য একজন সংহারকর্ত্তা কল্পনা করিয়াছ। সৃষ্ট জীবের ধ্বংস তাঁহার কার্য্য —যত সৃষ্টি হয় তত যে রক্ষা হয় না, ইহা তাঁহারই কার্য্য। পাতা এবং সৃষ্টিকর্ত্তা এক, কিন্তু তিনি যত সৃষ্টি করেন, তত যে রক্ষা করিতে পারেন না, তাহার কারণ এই সংহারকর্ত্তার শক্তি। নচেৎ সকলের রক্ষাই যে তাঁহার অভিপ্রায় নহে,এমত কল্পনীয় নহে। যেখানে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, কল্পনা করিয়াছ, সেখানে তিনি যে সকলকে রক্ষা করিতে পারেন না, ইহাই বলা উচিত; সকলের রক্ষা যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে ইহা বলিতে পার না। উত্তর এই।

ইহারও প্রত্যুত্তর আছে। জগতের অবস্থা, জগতে যে সকল নিয়ম চলিতেছে, সে সকলের অথবা সেই সংহারিকা-

শক্তির আলোচনা করিলে ইহাই সহজে বুঝা যায়, যে এ জগতে অপরিমিত সংখ্যক জীব রক্ষণীয় নহে—অতএব অপরিমিত জীব-সৃষ্টি নিষ্ফল। সামান্য মনুষ্যের সামান্য বুদ্ধি দ্বারা একথা প্রাপণীয়। অতএব যিনি স্রষ্টা ও পাতা, তিনিও ইহা অবশ্য বিলক্ষণ জানেন। না জানিলে তিনি মনুষ্যাপেক্ষা অদূরদর্শী। কিন্তু তিনি কৌশলময়—জীবসৃজনপ্রণালী অপূর্ব্ব কৌশল-সম্পন্ন, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যাঁহার এত কৌশল তিনি কথনও অদূরদর্শী হইতে পারেন না। যদি তাঁহাকে অদূরদর্শী বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই সকল কৌশল যে চৈতন্যপ্রণীত একথা আর বলিতে পারিবে না, কেন না অদূরদর্শী চৈতন্য হইতে সেরূপ কৌশল অসম্ভব। তবে, বলিতে হইবে যে তিনি জানিয়া নিষ্ফল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত। দূরদর্শী চৈতন্য যে নিষ্ফল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। কারণ নিষ্ফলতা বুদ্ধি বা প্রবৃত্তির লক্ষ্য হইতে পারে না।

অতএব ইহা সিদ্ধ, যিনি পালনকর্ত্তা, অপরিমিত জীবসৃষ্টি তাঁহার ক্রিয়া নহে। এজন্য পালনকর্ত্তা হইতে পৃথক্ চৈতন্যকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কল্পনা করা অসঙ্গত নহে।

ইহাতেও আপত্তি হইতে পারে, যে, স্রষ্টা ও পাতা পৃথক্ স্বীকার করিলেও অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে, যে স্রষ্টা নিষ্ফল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত; চৈতন্য নিষ্ফল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, এ আপত্তির মীমাংসা কই হইল? সত্য কথা, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ যে, পাতা হইতে স্রষ্টা যদি পৃথক্ হইলেন, তবে সৃষ্ট জীবের রক্ষা তাঁহার উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা করিবার আর কারণ নাই। সৃষ্টি তাঁহার এক মাত্র অভিপ্রায়; এবং

সৃষ্টি হইলেই তাঁহার অভিপ্রায়ের সফলতা হইল—রক্ষা না হইলেও সে অভিপ্রায়ের নিষ্ফলতা নাই।

অতএব, স্রষ্টা, পাতা, এবং হর্ত্তা, পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্য এমত বিবেচনা করা, অসঙ্গত এবং প্রমাণবিরুদ্ধ নহে—ইহাই হিন্দু-ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তি, এবং এই স্রষ্টা পাতা ও হর্ত্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বলিয়া পরিচিত। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি কথা বলিবার আছে।

প্রথম, আমরা বলিতেছি না যে এই ত্রিদেবের উপাসনা এই রূপে ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা এমত বিশ্বাস করি না যে ভারতীয় ধর্ম্মস্থাপকগণ এই রূপ বৈজ্ঞানিক বিচার করিয়া ত্রিদেবের কল্পনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের উৎপত্তি বেদগীত বিষ্ণু রুদ্রাদি হইতে। বৈদিক বিষ্ণু রুদ্রাদি বৈজ্ঞানিক সঙ্কল্প নহে, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ বেদেই আছে। কিন্তু পাতৃত্ব হর্ত্তৃত্ব স্রষ্টৃত্বের সূচনাও বেদে আছে। তবে অদ্বিতীয় দর্শনশাস্ত্রবিৎ ভারতীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এই ত্রিদেবোপাসনা গৃহীত হইয়াছিল, জনসাধারণে উহা বদ্ধমূল, ইহাতে অবশ্য এমত বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে উহার সুদৃঢ় নৈসর্গিক ভিত্তি আছে। লোকবিশ্বাসের সেই গূঢ় নৈসর্গিক ভিত্তি কি তাহাই আমরা দেখাইলাম।

আমাদিগের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, এই ত্রিদেবোপাসনার নৈসর্গিক ভিত্তি আছে বটে, কিন্তু আমরা এমত কিছু লিখি নাই এবং বিচারেও এমত কোন কথাই পাওয়া যায় না, যে তদ্দ্বারা এই ত্রিদেবের অস্তিত্ব বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণীকৃত বলিয়া স্বীকার করা যায়। প্রমাণে দুইটি গুরুতর ছিদ্র লক্ষিত হয়।

প্রথম এই, যে জগতের নির্ম্মাণকৌশলে চৈতন্যযুক্ত নির্ম্মাতার অস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে এই কথা স্বীকার করাতেই ত্রিদে-

বের অস্তিত্ব সঙ্গত বলিয়া সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম সূত্রটী ভ্রান্তিজনিত; প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলকেই নির্ম্মাণ-কৌশল বলিয়া আমাদিগের ভ্রম হয়, সেই ভ্রান্ত জ্ঞানেই আমরা নির্ম্মাতাকে সিদ্ধ করিয়াছি। নচেৎ নির্ম্মাতার অস্তিত্বের নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। নির্ম্মাতার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই আমরা সংহারকর্ত্তা, এবং পৃথক্ পৃথক স্রষ্টা পাতা পাইয়াছি। যদি নির্ম্মাতার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, তবে ত্রিদেবের মধ্যে কাহারও অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই।

দ্বিতীয় দোষ এই, যে সৃজন পালন সংহার, একই নিয়মাবলীর ফল। বিজ্ঞান ইহাই শিখাইতেছে যে, যে যে নিয়মের ফলে সৃজন, সেই সেই নিয়মের ফলে পালন, সেই সেই নিয়মের ফলে ধ্বংস। নিয়ম যেখানে এক, নিয়ন্তা সেখানে পৃথক্ সঙ্কল্প করা প্রামাণ্য নহে। আমরা কোথাও বলি নাই যে তাহা প্রামাণ্য। আমরা কেবল বলিয়াছি যে, তাহা অপ্রামাণ্য বা অসঙ্গত নহে, সঙ্গত। যাহা প্রমাণবিরুদ্ধ নহে, বা যাহা কেবল সঙ্গত, তাহা সুতরাং প্রামাণিক, ইহা বলা যাইতে পারে না।

আমাদিগের তৃতীয় বক্তব্য এই যে, ত্রিদেবের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেও, তাঁহাদিগকে সাকার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পুরাণেতিহাসে যে সকল আনুষঙ্গিক কথা আছে, তৎপোষকে কিছু মাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না। ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রত্যেকেই কতক গুলি অদ্ভুত উপন্যাসের নায়ক। সেই সকল উপন্যাসের তিলমাত্র নৈসর্গিক ভিত্তি নাই। যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে বিশ্বাস করেন, তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিতে পারি না; কিন্তু তাই বলিয়া পুরাণেতিহাসে বিশ্বাসের কোন কারণ আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি না।

চতুর্থ, ত্রিদেবের অস্তিত্বের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই,

ইহা যথার্থ, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে মহাবিজ্ঞানকুশলী ইউরোপীয় জাতির অবলম্বিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মাপেক্ষা, হিন্দুদিগের এই ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানসঙ্গত এবং নৈসর্গিক। ত্রিদেবোপাসনা বিজ্ঞানমূলক না হউক, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। কিন্তু একজন সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, এবং দয়াময় ঈশ্বরে বিশ্বাস যে, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, তাহা উপরিকথিত মিলকৃত বিচারে সপ্রমাণ হইয়াছে।

পঞ্চম। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের পুনঃসংস্কারে নিযুক্ত, তাঁহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে একেশ্বরবাদের পুনরুজ্জীবন অপেক্ষা, ত্রিদেবোপাসনার পুনরুজ্জীবন অধিক সহজ, বিজ্ঞানসঙ্গত, এবং লোকানুমত হয় কি না ?

ষষ্ঠ। এই প্রবন্ধে অনেক স্থানে এমত কথা আছে যে তদ্দ্বারা অনেকে বুঝিতে পারেন, যে ঈশ্বর বৈজ্ঞানিক প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ নহে। বস্তুতঃ এ কথা ঠিক নহে। সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, দয়াময় এবং প্রবৃত্তিশালী ঈশ্বরই বিজ্ঞানের দ্বারা অসিদ্ধ, ইহাই আমরা বলিয়াছি। জগতের নির্ম্মাতা বিজ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ নহেন। কিন্তু বিজ্ঞানে ইহা পদে পদে প্রমাণীকৃত হইতেছে যে এই জগৎ ব্যাপিয়া, সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যে, এক অনন্ত, অচিন্তনীয়, অজ্ঞেয় শক্তি আছে—ইহা সকলের কারণ, বহির্জগতের অন্তরাত্মা স্বরূপ। সেই মহাবলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা দূরে থাকুক, আমরা তদুদ্দেশে ভক্তিভাবে কোটি কোটি কোটি প্রণাম করি।



ভারত কলঙ্ক।

ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?

ভারতবর্ষ এতকাল পরাধীন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সকলে বলিয়া থাকেন, ভারতবর্ষীয়েরা হীনবল এইজন্য। "Effeminate Hindoos" ইউরোপীয়দিগের মুখাগ্রে সর্ব্বদাই আছে। ইহাই ভারতের কলঙ্ক। কিন্তু আবার ইউরোপীয়দিগের মুখেই ভারতবর্ষীয় সিপাহীদিগের বল ও সাহসের প্রশংসা শুনা যায়। সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের বাহুবলেই কাবুল জিত হইল। বলিতে গেলে সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের সাহায্যেই তাঁহারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন। তাঁহারা স্বীকার করুন বা না করুন, সেই স্ত্রীস্বভাব হিন্দুদিগের কাছে—মহারাষ্ট্র এবং শিকের কাছে অনেক রণক্ষেত্রে তাঁহারা পরাস্ত হইয়াছেন।

আধুনিক হিন্দুদিগের বলবীর্য্য এখন যাহাই হউক প্রাচীন হিন্দুদিগের অপেক্ষা যে তাহা ন্যূন তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শত শত বৎসরের অধীনতায় তাহার হ্রাস অবশ্য ঘটিয়া থাকিবে। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়গণ পরজাতি কর্ত্তৃক বিজিত হইবার পূর্ব্বে যে বিশেষ বলশালী ছিলেন, এমত বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে—দুর্ব্বল বলিয়া তাঁহারা পরাধীন হয়েন নাই।

আমরা স্বীকার করি, যে এই পক্ষ সমর্থন করা সহজ নহে, এবং এতদ্বিষয়ে পর্য্যাপ্ত প্রমাণপ্রাপ্তি দুঃসাধ্য। এই তর্ক কেবল পুরাবৃত্ত অবলম্বন করিয়া মীমাংসা করা সম্ভব, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে অন্যান্য জাতীয়দিগের ন্যায় ভারতবর্ষীয়েরা আপনাদি-

গের কীর্ত্তিকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয়দিগের যে শ্লাঘনীয় সমরকীর্ত্তি ছিল, তাহাও লোপ হইয়াছে। যে গ্রন্থগুলিন "পুরাণ" বলিয়া খ্যাত আছে, তাহাতে প্রকৃত পুরাবৃত্ত কিছুই নাই। যাহা কিছু আছে তাহা অনৈসর্গিক এবং অতিমানুষ উপন্যাসে এরূপ আচ্ছন্ন, যে প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা কোন রূপেই নিশ্চিত হয় না।

ভাগ্যক্রমে, ভিন্নদেশীয় ইতিহাস-বেত্তাদিগের গ্রন্থে দুই স্থানে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের যুদ্ধাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, মাকিদনীয় আলেকজণ্ডর বা সেকন্দর দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রচনাকুশল যবনলেখকেরা তাহা পরিকীর্ত্তিত করিয়াছেন। দ্বিতীয় মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয়ার্থ যে সকল উদ্যম করিয়াছিলেন, তাহা মুসলমান ইতিবৃত্ত লেখকেরা বিবরিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমেই বক্তব্য যে, এরূপ সাক্ষীর পক্ষপাতিত্বের গুরুতর সম্ভাবনা। মনুষ্য চিত্রকর বলিয়াই চিত্রে সিংহ পরাজিত স্বরূপ লিখিত হয়। যে সকল ইতিহাসবেত্তা আত্মজাতির লাঘব স্বীকার করিয়া সত্যের অনুরোধে শত্রুপক্ষের যশঃকীর্ত্তন করেন তাঁহারা অতি অল্পসংখ্যক। অপেক্ষাকৃত মূঢ়, আত্মগরিমাপরায়ণ মুসলমানদিগের কথা দূরে থাকুক, কৃতবিদ্য, সত্যনিষ্ঠাভিমানী ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্তারা এই দোষে এরূপ কলঙ্কিত, যে তাঁহাদের রচনা পাঠ করিতে কখন কখন ঘৃণা করে। এই জন্য দেশীয় এবং বিপক্ষদেশীয়, উভয়বিধ ইতিহাসবেত্তাদিগের লিপির সাহায্য না পাইলে, কোন ঘটনারই যাথার্থ্য নির্ণীত হয় না। কেবল আত্মগরিমাপরবশ, পর-ধর্ম্মদ্বেষী, সত্যভীত মুসলমান লেখকদিগের কথার উপর নির্ভর করিয়া, প্রাচীন

ভারতবর্ষীয়দিগের রণনৈপুণ্য মীমাংসা করা যাইতে পারে না। সে যাহাই হউক, নিম্নলিখিত দুইটী কথা মুসলমান পুরাবৃত্ত হইতেই বিচারের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে।

প্রথম, আরব-দেশীয়েরা এক প্রকার দিগ্‌বিজয়ী। যখন যে দেশ আক্রমণ করিয়াছে, তখনই তাহারা সেই দেশ জয় করিয়া পৃথিবীতে অতুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা কেবল দুই দেশ হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হয়। পশ্চিমে ফ্রান্স, পূর্ব্বে ভারতবর্ষ। আরব্যেরা মিশর ও সিরিয়া দেশ মহম্মদের মৃত্যুর পর ছয় বৎসর মধ্যে, পারস্য দশ বৎসরে, আফ্রিকা ও স্পেন এক এক বৎসরে, কাবুল অষ্টাদশ বৎসরে, তুর্কস্থান আট বৎসরে, সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করে। কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষ জয়ের জন্য এক শত বৎসর পর্য্যন্ত যত্ন করিয়াও ভারতবর্ষ হস্তগত করিতে পারে নাই। মহম্মদ বিনকাসিম সিন্ধুদেশ অধিকৃত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি রাজপুতানা হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর কিছু কাল পরে সিন্ধু রাজপুতগণ কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হইয়াছিল। ভারত জয় দিগ্‌বিজয়ী আরব্যদিগের সাধ্য হয় নাই। এলফিন্‌ষ্টোন বলেন যে হিন্দুদিগের দেশীয় ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ়ানুরাগই এই অজেয়তার কারণ। আমরা বলি রণনৈপুণ্য,—যোধশক্তি। হিন্দুদিগের আত্মধর্ম্মানুরাগ অদ্যাপি ত বলবৎ। তবে কেন হিন্দুরা সাত শত বৎসর পরজাতিপদানত?

দ্বিতীয়, যখন কোন প্রাচীন দেশের নৈকট্যে নবাভ্যুদয়বিশিষ্ট এবং বিজয়াভিলাষী জাতি অবস্থিতি করে, তখন প্রাচীন জাতি প্রায় নবীনের প্রভুত্বাধীন হইয়া যায়। এইরূপ সর্ব্বাক্রান্তকারী বিজয়াভিলাষী জাতি, প্রাচীন ইউরোপে রোমকেরা, আসিয়ায় আরব্য ও তুরকীয়েরা। যে যে জাতি ইহাদিগের

সংস্রবে আসিয়াছে, তাহারাই পরাভূত হইয়া ইহাদিগের অধীন হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে হিন্দুরা যত দূর দুর্জ্জেয় হইয়াছিল, এতাদৃশ আর কোন জাতিই হয় নাই। আরব্যগণ কর্ত্তৃক যত অল্পকালমধ্যে মিশর, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, পারস্য, তুরক, এবং কাবুলরাজ্য উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তদপেক্ষা সুবিখ্যাত কতিপয় সাম্রাজ্যের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। রোমকেরা প্রথম ২০০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে গ্রীস আক্রমণ করে। তদবধি ৫২ বৎসর মধ্যে ঐ রাজ্য একেবারে নিঃশেষ বিজিত হয়। সুবিখ্যাত কার্থেজ রাজ্য ২৬৪ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে প্রথম রোমকদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। ১৪৬ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে, অর্থাৎ এক শত বিশ বৎসর মধ্যে সেই রাজ্য রোমকগণ কর্ত্তৃক ধ্বংসিত হয়। পূর্ব্ব রোমক বা গ্রীক সাম্রাজ্য চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তুরকীয়গণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ পঞ্চাশৎ বৎসর মধ্যে তুরকী দ্বিতীয় মহম্মদের হস্তে বিলুপ্ত হয়। পশ্চিম রোমক, যাহার নাম অদ্যাপি জগতে বীরদর্পের পতাকাস্বরূপ, তাহাই ২৮৬ খৃষ্টাব্দে উত্তরীয় বর্ব্বরজাতি কর্ত্তৃক প্রথম আক্রান্ত হইয়া ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ প্রথম বর্ব্বর বিপ্লবের ১৯০ বৎসর মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে আরব্য মুসলমানগণ কর্ত্তৃক প্রথম আক্রান্ত হয়। তদব্দ হইতে পাঁচ শত উনত্রিশ বৎসর পরে শাহাবুদ্দীন ঘোরী কর্ত্তৃক উত্তর ভারত অধিকৃত হয়। শাহাবুদ্দীন বা তাঁহার অনুচরেরা আরব্য জাতীয় ছিলেন না। আরব্যেরা যেরূপ বিফলযত্ন হইয়াছিল, গজনী নগরাধিষ্ঠাতা তুরকীয়েরা তদ্রূপ। যাহারা পৃথ্বীরাজ, জয়চন্দ্র এবং সেনরাজা প্রভৃতি হইতে উত্তর ভারতরাজ্য অপহরণ করে, হতারা পাঠান বা আফগান। আরব্যদিগের প্রথম

ভারতাক্রমণের ৫২৯ বৎসর ও তুরকীদিগের প্রথম ভারতাক্রমণের ২১৩ বৎসর পরে, তৎস্থানীয় পাঠানেরা ভারতরাজ্যাধিকার করিয়াছিল। পাঠানেরা কখনই আরবা বা তুরকী বংশীয়দিগের ন্যায়, সমৃদ্ধিসম্পন্ন বা প্রতাপান্বিত নহে। তাহারা কেবল পূর্ব্বগত আরব্য ও তুরকীদিগের সূচিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। আরব্য, তুরকী, এবং পাঠান, এই তিন জাতির যত্ন-পারম্পর্য্যে সার্দ্ধ পাঁচ শত বৎসরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়।*

মুসলমান সাক্ষীরা এইরূপ বলে। ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ইহাদের নিকট হিন্দুরা যখন পরিচিত হইয়াছিলেন, তখন হিন্দুদিগের সুসময় প্রায় অতীত হইয়াছিল,—রাজলক্ষ্মী ক্রমে ক্রমে মলিনা হইয়া আসিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অব্দের পূর্ব্বগত হিন্দুরা অধিকতর বলবান্ ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সেই সময়ে গ্রীকদিগের সহিত পরিচয়। তাহারা নিজে অদ্বিতীয় বলবান্। তাহারা ভূয়োভূয়ঃ ভারতবর্ষীয়দিগের সাহস ও রণনৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছে। মাকিদনীয় বিপ্লব বর্ণন কালে, তাহারা এইরূপ পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিয়াছে যে, আসিয়া প্রদেশে এইরূপ রণপণ্ডিত দ্বিতীয় জাতি তাহারা দেখে নাই। এবং হিন্দুগণ কর্ত্তৃক যেরূপ গ্রীক সৈন্যহানি হইয়াছিল, এরূপ অন্য কোন জাতি কর্ত্তৃক হয় নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের রণদক্ষতা সম্বন্ধে যদি কাহারও সংশয় থাকে, তবে তিনি মাকিদনীয় বিপ্লবের বৃত্তান্তলেখক গ্রীকদিগের গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

---

* পশ্চিমাংশে আরব্য ও তুরকীয়েরয়া কিছু ভূমি অধিকার করিয়াছিল মাত্র।

ভারতভূমি সর্ব্বরত্নপ্রসবিনী, পররাজগণের নিতান্ত লোভের পাত্রী। এই জন্য সর্ব্বকালে নানা জাতি আসিয়া উত্তর পশ্চিমে পার্ব্বত্যদ্বারে প্রবেশ লাভ পূর্ব্বক ভারতাধিকারের চেষ্টা পাইয়াছে। পারসীক, যোন, বাহ্লিক, শক, হুন, আরবা, তুরকী সকলেই আসিয়াছে, এবং সিন্ধু পারে বা তদুভয় তীরে স্বল্প প্রদেশ কিছু দিনের জন্য অধিকৃত করিয়া, পরে বহিষ্কৃত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত, আর্য্যেরা সকল জাতিকে শীঘ্র বা বিলম্বে দূরীকৃত করিয়া আত্মদেশ রক্ষা করিয়াছিল। পঞ্চদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল জাতি মাত্রেরই আক্রমণস্থলীভূত হইয়া এতকাল যে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছে, এরূপ অন্য কোন জাতি পৃথিবীতে নাই, এবং কখন ছিল কি না সন্দেহ। জাতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যে হিন্দুদিগের সমৃদ্ধি অক্ষয় হইয়াছিল, তাহাদিগের বাহুবলই ইহার কারণ, সন্দেহ নাই। অন্য কারণ দেখা যায় না।

এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও সর্ব্বদা শুনা যায় যে, হিন্দুরা চিরকাল রণে অপারগ। অদূরদর্শীদিগের নিকট ভারতবর্ষের এই চিরকলঙ্কের তিনটি কারণ আছে।

প্রথম,—হিন্দু ইতিবৃত্ত নাই;—আপনার গুণগান আপনি না গাহিলে কে গায়? লোকের ধর্ম্ম এই যে, যে আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত না করে, কেহ তাহাকে মানুষের মধ্যে গণ্য করে না। কোন জাতির সুখ্যাতি কবে অপর জাতি কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে? রোমকদিগের রণ-পাণ্ডিত্যের প্রমাণ—রোমকলিখিত ইতিহাস। গ্রীকদিগের যোদ্ধৃগুণের পরিচয়,—গ্রীক লিখিত গ্রন্থ। মুসলমানেরা যে মহারণকুশলী, ইহাও কেবল মুসলমানের কথাতেই বিশ্বাস

করিয়া জানিতে পারিতেছি। কেবল সে গুণে হিন্দুদিগের গৌরব নাই—কেন না সে কথার হিন্দু সাক্ষী নাই।

দ্বিতীয় কারণ,—যে সকল জাতি পররাজ্যাপহারী, প্রায় তাহারাই রণপণ্ডিত বলিয়া অপর জাতির নিকট পরিচিত হইয়াছে। যাহারা কেবল আত্মরক্ষা মাত্রে সন্তুষ্ট হইয়া, পররাজ্য লাভের কখন ইচ্ছা করে নাই, তাহারা কখনই বীরগৌরব লাভ করে নাই। ন্যায়নিষ্ঠা এবং বীরগৌরব একাধারে সচরাচর ঘটে না। অদ্যাপি এ দেশীয় ভাষায়, "ভাল মানুষ" শব্দের অর্থ ভীরুস্বভাবের লোক—অকর্ম্মা। "হরি নিতান্ত ভাল মানুষ।" অর্থ—হরি নিতান্ত অপদার্থ!

হিন্দুরাজগণ যে একেবারে পররাজ্যে লোভশূন্য ছিলেন, এমত আমরা বলি না। তাঁহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিতে কখন ক্রটি করিতেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ, হিন্দুরাজ্যকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। ভারতবর্ষ এতাদৃশ বিস্তৃত প্রদেশ যে, ক্ষুদ্র মণ্ডলাধিকারী রাজগণ কখন কেহ তাহার বাহিরে দেশজয়ে যাইবার বাসনা করিতেন না; কোন হিন্দু রাজা কস্মিনকালে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্য-ভুক্ত করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুরা যবন ম্লেচ্ছ প্রভৃতি অপর ধর্ম্মাবলম্বী জাতি-গণকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন; তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিবার কোন প্রয়াস করিতেন, এমত সম্ভাবনা নহে; বরং তদ্দেশ-জয়ে যাত্রা করিলে আপন জাতি-ধর্ম্ম বিনাশের শঙ্কা করিবারই সম্ভাবনা। অতএব সক্ষম হইলেও হিন্দুরা ভারতবর্ষের বাহিরে বিজয়াকাঙ্ক্ষায় যাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সত্য বটে, এক্ষণকার কাবুল রাজ্যের অধিকাংশ পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজ্য-ভুক্ত ছিল, কিন্তু সে প্রদেশ তৎকালে ভারতবর্ষের একাংশ বলিয়া গণ্য হইত।

প্রাচীন হিন্দুদিগের এ কলঙ্কের তৃতীয় কারণ,—হিন্দুরা বহুদিন হইতে পরাধীন। যে জাতি বহুকাল পরাধীন, তাহাদিগের আবার বীরগৌরব কি? কিন্তু এক্ষণকার হিন্দুদিগের বীর্য্য-লাঘব, প্রাচীন হিন্দুদিগের অবমাননার উপযুক্ত কারণ নহে। প্রায় অনেক দেশেই দেখা যায় যে, প্রাচীন এবং আধুনিক লোকের মধ্যে চরিত্রগত সাদৃশ্য অধিক নহে। ইটালি ও গ্রীস, ভারতবর্ষের ন্যায় এই কথার উদাহরণস্থল। মধ্যকালিক ইটালীয়,এবং বর্ত্তমান গ্রীকদিগের চরিত্র হইতে প্রাচীন রোমক ও গ্রীকদিগের কাপুরুষ বলিয়া সিদ্ধ করা যাদৃশ অন্যায় আধুনিক ভারতবর্ষীয়দিগের পরাধীনতা হইতে প্রাচীনদিগের বললাঘব সিদ্ধ করা তাদৃশ অন্যায়।

আমরা এমতও বলি না যে, আধুনিক ভারতবর্ষীয়েরা নিতান্ত কাপুরুষ, এবং সেই জন্য এত কাল পরাধীন। এ পরাধীনতার অন্য কারণ আছে। আমরা তাহার দুইটি কারণ সবিস্তারে এ স্থলে নির্দ্দিষ্ট করি।

প্রথম, ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষারহিত। স্বদেশীয়,স্বজাতীয় লোকে আমাদিগকে শাসিত করুক পরজাতীয়দিগের শাসনাধীন হইব না, এরূপ অভিপ্রায় ভারতবর্ষীয়দিগের মনে আইসে না। স্বজাতীয়ের রাজশাসন মঙ্গলকর বা সুখের আকর, পরজাতীয়ের রাজদণ্ড পীড়াদায়ক বা লাঘবের কারণ, এ কথা তাহাদের বড় হৃদয়ঙ্গত নহে। পরতন্ত্রতা অপেক্ষা স্বতন্ত্রতা ভাল,এরূপ একটা তাহাদিগের বোধ থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু সেটি বোধমাত্র—সে জ্ঞান আকাঙ্ক্ষায় পরিণত নহে। অনেক বস্তু আমাদিগের ভাল বলিয়া জ্ঞান থাকিতে পারে, কিন্তু সে জ্ঞানে তৎপ্রতি সকল স্থানে আকাঙ্ক্ষা জন্মে না। কে না হরিশ্চন্দ্রের দাতৃত্ব বা কার্শিয়সের দেশ-

বাৎসল্যের প্রশংসা করে? কিন্তু তাহার মধ্যে কয় জন হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী বা কার্শিয়সের ন্যায় আত্মঘাতী হইতে প্রস্তুত? প্রাচীন বা আধুনিক ইউরোপীয় জাতীয়দিগের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা বলবতী আকাঙ্ক্ষায় পরিণত। তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে স্বতন্ত্রতা ত্যাগের অগ্রে প্রাণ এবং সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্ত্তব্য। হিন্দুদিগের মধ্যে তাহা নহে। তাঁহাদের বিবেচনা "যে ইচ্ছা রাজা হউক, আমাদের কি? স্বজাতীয় রাজা, পরজাতীয় রাজা, উভয় সমান। স্বজাতীয় হউক, পরজাতীয় হউক, সুশাসন করিলে দুই সমান। স্বজাতীয় রাজা সুশাসন করিবে পরজাতীয় সুশাসন করিবে না, তাহার স্থিরতা কি? যদি তাহার স্থিরতা নাই, তবে কেন? স্বজাতীয় রাজার জন্য প্রাণ দিব? রাজ্য রাজার সম্পত্তি। তিনি রাখিতে পারেন রাখুন। আমাদিগের পক্ষে উভয় সমান। কেহই আমাদিগের ষষ্ঠ ভাগ ছাড়িবে না, কেহই চোরকে পুরস্কৃত করিবে না। যে রাজা হয় হউক, আমরা কাহারও জন্য অঙ্গুলি ক্ষত করিব না।*"

---

* আমরা এমত বলি না, যে ভারতবর্ষে কখন কোন স্বাতন্ত্র্যভক্ত জাতি ছিল না। মীবার-রাজপুতদিগের অপূর্ব্ব কাহিনী যাঁহারা টডের গ্রন্থে অবত হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন, যে ঐ রাজপুতগণ হইতে স্বাতন্ত্র্যোন্মত্ত জাতি কখন পৃথিবীতে দেখা দেয় নাই। সেই স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তার ফলও চমৎকার। মীবার ক্ষুদ্র রাজ্য হইয়াও ছয় শত বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমান সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে স্বাধীন হিন্দু রাজপতাকা উড়াইয়াছে। আকবর বাদসাহের বাহুবলও মীবার ধ্বংসে সক্ষম হয় নাই। অদ্যাপি উদয়পুরের রাজবংশ পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীন রাজবংশ বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু এক্ষণে আর সে দিন নাই। সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। উপরে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা সাধারণ হিন্দুসম্বন্ধে যথার্থ।

আমরা এক্ষণে স্বাতন্ত্র্যপর ইংরেজদিগের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এই সকল কথার ভ্রম দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু ইহা অস্বাভাবিক নহে, এবং ইহার ভ্রান্তি সহজে অনুমেয়ও নহে। স্বভাববশতঃ কোন জাতি অসভ্যকাল হইতেই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়; স্বভাববশতঃ কোন জাতি সুসভ্য হইয়াও তৎপ্রতি আস্থাশূন্য। এই সংসারে অনেক গুলিন স্পৃহণীয় বস্তু আছে; তন্মধ্যে সকলেই সকল বস্তুর জন্য যত্নবান্ হয় না। ধন এবং যশঃ উভয়েই স্পৃহণীয়। কিন্তু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, এক ব্যক্তি ধনসঞ্চয়েই রত, যশের প্রতি তাহার অনাদর; অন্য ব্যক্তি যশোলিপ্সু, ধনে হতাদর। রাম, ধনসঞ্চয়ে একব্রত হইয়া, কার্পণ্য, নীচাশয়তা প্রভৃতি দোষে যশোহানি করিতেছে; যদু, অমিত ধনরাশি নষ্ট করিয়া, দাতৃত্বাদি গুণে যশঃ সঞ্চয় করিতেছে। রাম ভ্রান্ত কি যদু ভ্রান্ত, তাহার মীমাংসা নিতান্ত সহজ নহে। অন্ততঃ ইহা স্থির যে উভয়মধ্যে, কাহারও কার্য্য স্বভাববিরুদ্ধ নহে। সেইরূপ গ্রীকেরা স্বাধীনতাপ্রিয়; হিন্দুরা স্বাধীনতাপ্রিয় নহে, শান্তিসুখের অভিলাষী; ইহা কেবল জাতিগত স্বভাববৈচিত্র্যের ফল, বিস্ময়ের বিষয় নহে।

কিন্তু অনেকে এ কথা মনে করেন না। হিন্দুরা যে পরাধীন, স্বাধীনতালাভের জন্য উৎসুক নহে, ইহাতে তাঁহারা অনুমান করেন যে হিন্দুরা দুর্ব্বল, রণভীরু, স্বাধীনতালাভে অক্ষম; এ কথা তাঁহাদের মনে পড়ে না যে, হিন্দুরা সাধারণতঃ স্বাধীনতা লাভে অভিলাষী বা যত্নবান্ নহে। অভিলাষী বা যত্নবান্ হইলেই লাভ করিতে পারে।

স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা, কেবল আধুনিক হিন্দুদিগের স্বভাব এমত আমরা বলি না; ইহা হিন্দুজাতির চিরস্বভাব বোধ হয়। যিনি এমত বিবেচনা করেন যে, হিন্দুরা সাত শত বৎসর স্বাতন্ত্র্যহীন

হইয়া, এক্ষণে তদ্বিষয়ে আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়াছে, তিনি অযথার্থ অনুমান করেন। সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে কোথাও এমন কিছু পাওয়া যায় না যে, তাহা হইতে পূর্ব্বতন হিন্দুগণকে স্বাধীনতা-প্রয়াসী বলিয়া সিদ্ধ করা যাইতে পারে। পুরাণোপপুরাণ কাব্য নাটকাদিতে কোথাও স্বাধীনতার গুণগান নাই। মীবার ভিন্ন কোথাও দেখা যায় না যে, কোন হিন্দুসমাজ স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষায় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রাজার রাজ্যসম্পত্তি রক্ষায় যত্ন, বীরের বীরদর্প, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধপ্রয়াস, এ সকলের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য লাভাকাঙ্ক্ষা সে সকলের মধ্যগত নহে। স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, এ সকল নূতন কথা।

ভারতবর্ষীয়দিগের এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থার কারণানুসন্ধান করিলে তাহাও দুর্জ্ঞেয় নহে। ভারতবর্ষের ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি এবং বায়ুর তাপাতিশয্য প্রভৃতি ইহার গৌণ কারণ। ভূমি উর্ব্বরা, দেশ সর্ব্বসামগ্রী-পরিপূর্ণ, অল্পায়াসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। লোককে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, এ জন্য অবকাশ যথেষ্ট। শারীরিক পরিশ্রম হইতে অধিক অবকাশ হইলে, সহজেই মনের গতি আভ্যন্তরিক হয়; ধ্যানের বাহুল্য ও চিন্তার বাহুল্য হয়। তাহার এক ফল কবিত্ব, জগত্তত্ত্বে পাণ্ডিত্য। এই জন্য হিন্দুরা অল্পকালে অদ্বিতীয় কবি এবং দার্শনিক হইয়াছিলেন। কিন্তু মনের আভ্যন্তরিক গতির দ্বিতীয় ফল বাহ্যসুখে অনাস্থা। বাহ্যসুখে অনাস্থা হইলে সুতরাং নিশ্চেষ্টতা জন্মিবে। স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থা এই স্বাভাবিক নিশ্চেষ্টতার এক অংশ মাত্র। আর্য্য ধর্ম্মতত্ত্বে, আর্য্য দর্শনশাস্ত্রে এই অচেষ্টা-পরতা, সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কি বৈদিক, কি বৌদ্ধ, কি পৌরাণিক ধর্ম্ম, সকলেই এই নিশ্চেষ্ট-

তারই সম্বর্দ্ধনাপরিপূর্ণ। বেদ হইতে বেদান্ত সাংখ্যাদি দর্শনের উৎপত্তি; তদনুসারে লয় বা ভোগক্ষান্তিই মোক্ষ; নিষ্কামত্বই পুণ্য। বৌদ্ধধর্ম্মের সার,—নির্ব্বাণই মুক্তি। পৌরাণিক ধর্ম্মের দর্শন ভগবদ্গীতা। তাহার সার মর্ম্ম এই যে, সকল কর্ম্মই বৃথা, কর্ম্মহীনত্বই ভাল। এরূপ নিষ্কর্ম্ম-ধর্ম্ম-দীক্ষিত জাতি, বহুযত্নসাধ্য স্বাতন্ত্র্যের অনুরাগী হইবে কেন?

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, হিন্দুজাতি যদি চিরকাল স্বাতন্ত্র্যে হতাদর, তবে মুসলমানকৃত জয়ের পূর্ব্বে সার্দ্ধ সহস্র বৎসর তাহারা কেন যত্ন করিয়া পুনঃ পুনঃ পরজাতিবিমুখ পূর্ব্বক স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল? পরজাতিগণ সহজে কখন বিমুখ হয় নাই, অনেক কষ্টে হইয়া থাকিবে। যে সুখের প্রতি আস্থা নাই, সে সুখের জন্য হিন্দুসমাজ কেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছিল?

উত্তর, হিন্দুসমাজ যে কখন শক যবনপ্রভৃতিকে বিমুখীকরণ জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ কোথাও নাই। হিন্দুরাজগণ আপনার রাজ্যসম্পত্তি রক্ষার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সংগৃহীত সেনায় যুদ্ধ করিত; যখন পারিত শত্রু বিমুখ করিত, তাহাতেই দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হইত; তদ্ভিন্ন যে "আমাদের দেশে ভিন্ন জাতীয় রাজা হইতে দিব না" বলিয়া সাধারণ জনগণ কখন উৎসাহযুক্ত বা উদ্যমশালী হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ কোথাও নাই। বরং তদ্বিপরীতই প্রকৃত বলিয়া বিবেচনা হয়। যখনই সমরলক্ষ্মীর কোপদৃষ্টি প্রভাবে হিন্দু রাজা বা হিন্দু সেনাপতি রণে হত হইয়াছেন, তখনই হিন্দুসেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, আর যুদ্ধে সমবেত হয় নাই। কেন না আর কাহার জন্য যুদ্ধ করিবে? যখনই রাজা নিধনপ্রাপ্ত, বা অন্য কারণে রাজ্য

রক্ষায় নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন, তখনই হিন্দুযুদ্ধ সমাধা হইয়াছে। আর কেহ তাহার স্থানীয় হইয়া স্বাতন্ত্র্য পালনের উপায় করে নাই; সাধারণ সমাজ হইতে অরক্ষিত রাজ্যরক্ষার কোন উদ্যম হয় নাই। যখন বিধির বিপাকে যবন বা পারসিক, শক বা বাহ্লিক, কোন প্রদেশ খণ্ডের রাজাকে রণে পরাজিত করিয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছে, প্রজাগণ তখনই তাঁহাকে পূর্ব্বপ্রভুর তুল্য সমাদর করিয়াছে, রাজ্যাপহরণে কোন আপত্তি করে নাই। তিন সহস্র বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া, আর্য্যের সঙ্গে আর্য্যজাতীয়, আর্য্যজাতীয়ের সঙ্গে ভিন্ন জাতীয়, ভিন্ন জাতীয়ের সঙ্গে ভিন্ন জাতীয়;—মগধের সঙ্গে কান্যকুব্জ, কান্যকুব্জের সঙ্গে দিল্লী, দিল্লীর সঙ্গে লাহোর, হিন্দুর সঙ্গে পাঠান, পাঠানের সঙ্গে মোগল, মোগলের সঙ্গে ইংরেজ;—সকলের সঙ্গে সকলে বিবাদ করিয়া, চিরপ্রজ্বলিত সমরানলে দেশ দগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু সে সকল কেবল রাজায় রাজায় যুদ্ধ; সাধারণ হিন্দুসমাজ কখন কাহারও হইয়া কাহারও সহিত যুদ্ধ করে নাই। হিন্দুরাজগণ অথবা হিন্দুস্থানের রাজগণ, ভূয়োভূয়ঃ ভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক জিত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ হিন্দুসমাজ যে কখন কোন পরজাতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে, এমত বলা যাইতে পারে না; কেন না সাধারণ হিন্দুসমাজ কখন কোন পরজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে নাই।

এই বিচারে হিন্দুজাতির দীর্ঘকালগত পরাধীনতার দ্বিতীয় কারণ আসিয়া পড়িল। সে কারণ,—হিন্দুসমাজের অনৈক্য, সমাজমধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার অভাব, জাতি-হিতৈষার অভাব, অথবা অন্য যাহাই বলুন। আমরা সবিস্তারে তাহা বুঝাইতেছি।

আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, যদু হিন্দু, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দুমাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল,

তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্ত্তব্য। যাহাতে কোন হিন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্ত্তব্য। যেমন আমার এইরূপ কর্ত্তব্য, আর এইরূপ অকর্ত্তব্য তোমারও তদ্রূপ, রামের তদ্রূপ, যদুরও তদ্রূপ, সকল হিন্দুরই তদ্রূপ। সকল হিন্দুরই যদি এক রূপ কার্য্য হইল, তবে সকল হিন্দুর কর্ত্তব্য যে এক পরামর্শী, একমতাবলম্বী, একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করে। এই জ্ঞান জাতিপ্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ; অৰ্দ্ধাংশ মাত্র।

হিন্দুজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গল মাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতিপীড়ন করিতে হয়, করিব। অপিচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সে জন্য আত্মজাতির মঙ্গল সাধনে বিরত হইব না; পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয় তাহাও করিব। জাতিপ্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ।

দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ মনোবৃত্তি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ ভাব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহার গুরুতর দোষাবহ বিকার আছে। সেই বিকারে, জাতিসাধারণের এরূপ ভ্রান্তি জন্মে যে, পরজাতির মঙ্গল মাত্রেই স্বজাতির অমঙ্গল, পরজাতির অমঙ্গল মাত্রেই স্বজাতির মঙ্গল বলিয়া বোধ হয়। এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ইউরোপীয়েরা অনেক দুঃখ

ভোগ করিয়াছে। অনর্থক ইহার জন্যে অনেকবার সমরানলে ইউরোপ দগ্ধ করিয়াছে।

স্বজাতি-প্রতিষ্ঠা ভালই হউক বা মন্দই হউক, যে জাতি মধ্যে ইহা বলবৎ হয়, সে জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা প্রবলতা লাভ করে। আজি কালি এই জ্ঞান ইউরোপে বিশেষ প্রধান, এবং ইহার প্রভাবে তথায় অনেক বিষম রাজ্যবিপ্লব ঘটিতেছে। ইহার প্রভাবে ইটালি এক রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে বিষম প্রতাপশালী নূতন জর্ম্মান সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। আরও কি হইবে বলা যায় না।

এমত বলি না যে, ভারতবর্ষে এই জাতিপ্রতিষ্ঠা কস্মিন্ কালে ছিল না। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আর্য্য জাতীয়েরা চিরকাল ভারতবর্ষবাসী নহে। অন্যত্র হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া, তদ্দেশ অধিকার করিয়াছিল। প্রথম আর্য্যজয়ের সময়ে বেদাদির সৃষ্টি হয়, এবং সেই সময়কেই পণ্ডিতেরা বৈদিক কাল কহেন। বৈদিককালে এবং তাহার অব্যবহিত পরেই জাতিপ্রতিষ্ঠা যে আর্য্যগণের মধ্যে বিশেষ বলবৎ ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ বৈদিক মন্ত্রাদি মধ্যে পাওয়া যায়। তৎকালিক সমাজ-নিয়ন্তা ব্রাহ্মণেরা যে রূপে সমাজ বিধিবদ্ধ করিয়াছিল, তাহাও ঐ জ্ঞানের পরিচয়স্থল। আর্য্য বর্ণে এবং শূদ্রে যে বিষম বৈলক্ষণ্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও ইহার ফল। কিন্তু ক্রমে আর্য্যবংশ বিস্তৃত হইয়া পড়িলে আর সে জাতিপ্রতিষ্ঠা রহিল না। আর্য্যবংশীয়েরা বিস্তৃত ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ অধিকৃত করিয়া স্থানে স্থানে এক এক খণ্ড সমাজ স্থাপন করিল। ভারতবর্ষ এরূপ বহুসংখ্যক খণ্ড-সমাজে বিভক্ত হইল। সমাজভেদ, ভাষার ভেদ, আচার ব্যবহারের ভেদ, নানা ভেদ, শেষে জাতিভেদে পরিণত হইল।

বাহ্লিক হইতে পৌণ্ড্র পর্য্যন্ত, কাশ্মীর হইতে চোলা ও পাণ্ড্য পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতভূমি মক্ষিকাসমাকুল মধুচক্রের ন্যায় নানা জাতি, নানা সমাজে পরিপূর্ণ হইল। পরিশেষে, কপিলবাস্তুর রাজকুমার শাক্যসিংহের হস্তে এক অভিনব ধর্ম্মের সৃষ্টি হইলে, অন্যান্য প্রভেদের উপর ধর্ম্মভেদ জন্মিল। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা,ভিন্ন রাজ্য, ভিন্ন ধর্ম্ম; আর এক জাতীয়ত্ব কোথায় থাকে? সাগরমধ্যস্থ মীনদলবৎ ভারতবর্ষীয়েরা একতাশূন্য হইল। পরে আবার মুসলমান আসিল। মুসলমানদিগের বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কালে, সাগরোর্ম্মির উপর সাগরোর্ম্মিবৎ নূতন নূতন মুসলমান সম্প্রদায়, পাশ্চাত্য পর্ব্বতপার হইতে আসিতে লাগিল। দেশীয় লোকে সহস্রে সহস্রে রাজানুকম্পার লোভে বা রাজপীড়নে মুসলমান হইতে লাগিল। অতএব ভারতবর্ষ-বাসিগণ মুসলমান হিন্দু মিশ্রিত হইল। হিন্দু, মুসলমান,মোগল, পাঠান, রাজপুত, মহারাষ্ট্র, একত্র কর্ম্ম করিতে লাগিল। তখন জাতির ঐক্য কোথায়? ঐক্যজ্ঞান কিসে থাকিবে?

এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে,বংশের প্রভেদে, ধর্ম্মের প্রভেদে, নানা জাতি। বাঙ্গালী পঞ্জাবী, তৈলঙ্গী মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুসলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে? ধর্ম্মগত ঐক্য থাকিলে, বংশগত ঐক্য নাই, বংশগত ঐক্য থাকিলে ভাষাগত ঐক্য নাই, ভাষাগত ঐক্য থাকিলে নিবাসগত ঐক্য নাই। রাজপুত জাঠ, এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলে, ভিন্ন বংশীয় বলিয়া ভিন্ন জাতি; বাঙ্গালী, বেহারী এক বংশীয় হইলে ভাষাভেদে ভিন্ন জাতি; মৈথিলি কনোজী একভাষী হইলে, নিবাসভেদে ভিন্ন জাতি। কেবল ইহাই নহে। ভারতবর্ষের এমনই অদৃষ্ট, যেখানে কোন প্রদেশীয় লোক সর্ব্বাংশে এক; যাহাদের

এক ধর্ম্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, তাহাদের মধ্যেও জাতির একতাজ্ঞান নাই। বাঙ্গালির মধ্যে বাঙ্গালিজাতির একতা বোধ নাই, শীকের মধ্যে শীকজাতির একতা বোধ নাই। ইহারও বিশেষ কারণ আছে। বহুকাল পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক ভিন্ন জাতি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে ক্রমে জাতিজ্ঞান লোপ হইতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন নদীর মুখনির্গত জলরাশি যেমন সমুদ্রে আসিয়া পড়িলে, আর তন্মধ্যে ভেদজ্ঞান করা যায় না, বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত ভিন্ন জাতিগণের সেই রূপ ঘটে। তাহাদিগের পার্থক্য যায়, অথচ ঐক্য জন্মে না। রোমক সাম্রাজ্যমধ্যগত জাতিদিগের এইরূপ দশা ঘটিয়াছিল। হিন্দুদিগেরও তাহাই ঘটিয়াছে। জাতি-প্রতিষ্ঠা নানা কারণে ভারতবর্ষে অনেক দিন হইতে লোপ হইয়াছে। লোপ হইয়াছে বলিয়া কখন হিন্দু সমাজ কর্ত্তৃক কোন জাতীয় কার্য্য সমাধা হয় নাই। লোপ হইয়াছে বলিয়া, সকল জাতীয় রাজাই হিন্দু রাজ্যে বিনা বিবাদে সমাজ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছেন। এই জন্যই স্বাতন্ত্র্যরক্ষার কারণ হিন্দুসমাজ কখন তর্জ্জনীর বিক্ষেপও করে নাই।

ইতিহাসকীর্ত্তিত কালমধ্যে কেবল দুইবার হিন্দুসমাজ মধ্যে জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল। একবার, মহারাষ্ট্রে শিবজী এই মহামন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহনাদে মহারাষ্ট্র জাগরিত হইয়াছিল। তখন মহারাষ্ট্রীয়ে মহারাষ্ট্রীয়ে ভ্রাতৃভাব হইল। এই আশ্চর্য্য মন্ত্রের বলে অজিতপূর্ব্ব মোগল সাম্রাজ্য মহারাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল। চিরজয়ী মুসলমান হিন্দু কর্ত্তৃক বিজিত হইল। সমুদায় ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রের পদাবনত হইল। অদ্যাপি মার্হাট্টা, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষ ভাগে ভোগ করিতেছে।

দ্বিতীয় বারের ঐন্দ্রজালিক রণজিৎ সিংহ; ইন্দ্রজাল খালসা। জাতীয় বন্ধন দৃঢ় হইলে পাঠানদিগের স্বদেশেরও কিয়দংশ হিন্দুর হস্তগত হইল। শতদ্রু পারে সিংহনাদ শুনিয়া, নির্ভীক ইংরেজও কম্পিত হইল! ভাগ্যক্রমে ঐন্দ্রজালিক মরিল। পটুতর ঐন্দ্রজালিক ডালহৌসির হস্তে খালসা ইন্দ্রজাল ভাঙ্গিল। কিন্তু রামনগর এবং চিলিয়ানওয়ালা ইতিহাসে লেখা রহিল।

যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ডে জাতিপ্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদায় ভারত এক জাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত?

ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে; যে পথে কখন চলি নাই সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না।



ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা।

মনুষের এমন দুরবস্থা কখন হইতে পারে না, যে তাহাতে শুভ কিছুই দেখা যায় না। আমাদিগের গুরুতর দুর্ভাগ্যেও কিছু না কিছু মঙ্গল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যে অশুভের মধ্যে শুভের অনুসন্ধান করিয়া তাহার আলোচনা করে সেই বিজ্ঞ। দুঃখও যে কেবল দুঃখ নহে দুঃখের দিনে এ কথার আলোচনায় কিছু সুখ আছে।

ভারতবর্ষ পূর্ব্বে স্বাধীন ছিল—এখন অনেক শত বৎসর হইতে পরাধীন। নব্য ভারতবর্ষীয়েরা ইহা ঘোরতর দুঃখ মনে করেন। আমাদিগের ইচ্ছা যে সেই প্রাচীন স্বাধীনতায় এবং আধুনিক পরাধীনতায় একবার তুলনা করিয়া দেখি। দেখি যে দুঃখই বা কি সুখ কি।

কিন্তু স্বাধীনতা, ও পরাধীনতা, এই সকল কথার তাৎপর্য্য কি, তাহা একবার বিবেচনা করা আবশ্যক হইতেছে। আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষের তুলনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুলনার উদ্দেশ্য তারতম্য নির্দ্দেশ। কিন্তু কোন্ বিষয়ের তারতম্য আমাদিগের অনুসন্ধানের বিষয়? প্রাচীন ভারত স্বাধীন আধুনিক ভারত পরাধীন, একথা বলিয়া কি উপকার? আমাদিগের বিবেচনায়, এরূপ তুলনায় একটী মাত্র উদ্দেশ্য এই হওয়া আবশ্যক, যে প্রাচীন ভারতে মনুষ্য সুখী ছিল, কি আধুনিক ভারতবর্ষে অধিক সুখী?

এতক্ষণে অনেকে আমাদিগের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছেন। স্বাধীনতায় যে সুখ তাহাতে সংশয় কি? যে সংশয় করে সে পাষণ্ড, নরাধম, ইত্যাদি। স্বীকার করি। কিন্তু স্বাধীনতা পরাধীনতা অপেক্ষা কিসে ভাল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, ইহার সদুত্তর পাওয়া ভার।

বাঙ্গালি ইংরেজি পড়িয়া এ বিষয়ে দুইটী কথা শিখিয়াছেন —"Liberty,' Independence" তাহার অনুবাদে আমরা স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্রতা দুইটী কথা পাইয়াছি। অনেকেরই মনে বোধ আছে যে দুইটী শব্দে এক পদার্থকে বুঝায়। স্বজাতির শাসনাধীন অবস্থাকেই,ইহা বুঝায় এইটি সাধারণ প্রতীতি। রাজা যদি ভিন্নদেশীয় হয়েন, তবে তাঁহার প্রজাগণ পরাধীন, এবং সেই রাজ্য পরতন্ত্র। এই হেতু, এক্ষণে ইংরেজের শাসনাধীন ভারতবর্ষকে পরাধীন ও পরতন্ত্র বলা গিয়া থাকে। এই জন্য মোগলদিগের শাসিত ভারতবর্ষকে,বা সেরাজউদ্দৌলার শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বা পরতন্ত্র বলা গিয়া থাকে। এইরূপ সংস্কারের সমূলকতা বিবেচনা করা যাউক।

মহারাণী বিক্টোরিয়াকে ইংরেজকন্যা বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ প্রথম বা দ্বিতীয় জর্জ ইংরেজ ছিলেন না। তাঁহারা জর্ম্মান। তৃতীয় উইলিয়ম ওলন্দাজ ছিলেন। বোনাপার্টি কর্সিকার ইতালীয় ছিলেন। স্পেনের ভূতপূর্ব্ব প্রাচীন বুর্বোঁ বংশীয় রাজারা ফরাশী ছিলেন। রোম সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অনেক বর্ব্বর জাতীয় সম্রাট্ আরোহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ শত শত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেখা যাইতেছে এই সকল রাজ্যে তত্তদবস্থায় রাজা ভিন্নজাতীয় ছিলেন। ঐ সকল রাজ্য তত্তৎকালে পরাধীন বা পরতন্ত্র ছিল, বলা যাইতে পারে কি না? কেহই বলিবেন না, যে বলা যাইতে

পারে। যদি প্রথম জর্জশাসিত ইংলণ্ডকে, বা ত্রেজান শাসিত রোমকে পরাধীন বলা না গেল, তবে শাহ জাঁহা শাসিত ভারত বর্ষকে বা আলীবর্দ্দি শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বলি কেন?

দেখা যাইতেছে, যে শাসনকর্ত্তা ভিন্নজাতীয় হইলেই, রাজ্য পরতন্ত্র হইল না। পক্ষান্তরে, শাসনকর্ত্তা স্বজাতীয় হইলেই রাজ্য যে স্বতন্ত্র হয় না, তাহারও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ওয়াশিংটনের কৃত যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকার শাসনকর্তৃগণ, স্বজাতীয় ছিল। উপনিবেশ মাত্রেরই প্রথমাবস্থায় শাসনকর্ত্তা স্বজাতীয় হইয়া থাকে, কিন্তু সে অবস্থায় উপনিবেশ সকলকে কদাচ স্বতন্ত্র বলা যায় না।

তবে পরতন্ত্র কাহাকে বলি?

ইহা নিশ্চিত যে ইংরেজের অধীন আধুনিক ভারত পরতন্ত্র রাজ্য বটে। রোমকজিত, ব্রিটেন হইতে সিরিয়া পর্য্যন্ত রাষ্ট্র সকল, পরতন্ত্র ছিল বটে। আলজিয়র্স বা জামেকা পরতন্ত্র রাজ্য বটে। কিসে এই সকল রাজ্য পরতন্ত্র? এ সকল এক একটি পৃথক্ রাজ্য নহে, ভিন্নদেশবাসী রাজার রাজ্যের অংশ মাত্র। ভারতেশ্বরী ভারতবর্ষে থাকেন না—ভারতবর্ষের রাজা ভরতবর্ষে নাই। অন্যদেশে। যে দেশের রাজা অন্য দেশের সিংহাসনারূঢ় এবং অন্যদেশবাসী, সেই দেশ পরতন্ত্র।

দুইটি রাজ্যের এক রাজা হইলে তাহার একটি পরতন্ত্র, একটী স্বতন্ত্র। যে দেশে রাজা বাস করেন, সেইটি স্বতন্ত্র, যে দেশে বাস করেন না সেইটি পরতন্ত্র।

এইরূপ পবিভাষায় কতকগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। ইংলণ্ডের প্রথম জেমশ স্কটলণ্ড,ও ইংলণ্ড দুই রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া, স্কটলণ্ড ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে বাস করিলেন। স্কটলণ্ড কি ইংলণ্ডকে রাজ্য দিয়া পরতন্ত্র হইল? বাবরশাহ,

ভারত জয় করিয়া, দিল্লীতে সিংহাসন স্থাপন পূর্ব্বক, তথা হইতে পৈতৃক রাজ্য শাসিত করিতে লাগিলেন—তাঁহার স্বদেশ কি ভারতবর্ষের অধীন হইল? প্রথম জর্জ ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া তথায় অধিষ্ঠান করিয়া, পৈতৃক রাজ্য হানোবর শাসিত করিতে লাগিলেন;—হানোবর কি তখন পরতন্ত্র হইয়াছিল?

পরিভাষার অনুরোধে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে প্রথম জেমস্ বা প্রথম জর্জ বা প্রথম মোগলের পূর্ব্বরাজ্যের পরতন্ত্রতা ঘটিয়াছিল। কিন্তু পারতন্ত্র্য ঘটিয়াছিল মাত্র, পরাধীনতা ঘটে নাই। আমরা Independence শব্দের পরিবর্ত্তে স্বতন্ত্রতা, এবং Liberty শব্দের স্থানে স্বাধীনতা শব্দ এবং তত্তদভাব স্থানে তত্তদভাব সূচক শব্দ ব্যবহার করিতেছি।

তবে পারতন্ত্র্য এবং পরাধীনতার প্রভেদ কি? অথবা, স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার প্রভেদ কি?

ইংলণ্ডে রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটী বিশেষ প্রয়োগ প্রচলিত আছে, আমরা সে অর্থ অবলম্বন করিতে বাধ্য নহি। কেন না, সে অর্থ এই উপস্থিত বিচারের উপযোগী নহে। যে অর্থ ভারতবর্ষীয়েরা বুঝেন, আমরাও সেই অর্থ বুঝাইব।

ভিন্নদেশীয় লোক, কোন দেশে রাজা হইলে একটী অত্যাচার ঘটে। যাঁহারা রাজার স্বজাতি, দেশীয় লোকাপেক্ষা তাঁহাদিগের প্রাধান্য ঘটে। তাহাতে প্রজা পরজাতিপীড়িত হয়। যেখানে দেশীয় প্রজা, এবং রাজার স্বজাতীয় প্রজার এইরূপ তারতম্য, সেই দেশকে পরাধীন বলিব। যে রাজ্য পরজাতি-পীড়ন শূন্য তাহা স্বাধীন।

অতএব পরতন্ত্র রাজ্যকেও কখন স্বাধীন বলা যাইতে পারে। যথা প্রথম জর্জের সময়ে হানোবর,মোগল দিগের সময়ে কাবুল।

পক্ষান্তরে কখন স্বতন্ত্র রাজ্যকেও পরাধীন বলা যাইতে পারে, যথা নর্ম্মানদিগের সময়ে ইংলণ্ড, ও ঔরঙ্গেবের সময়ে ভারত-বর্ষ। আমরা কুতবউদ্দিনের অধীন উত্তর ভারতবর্ষকে পরতন্ত্র ও পরাধীন বলি, আক্‌বরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলি।

সে যাহাই হউক, প্রাচীন ভারত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন; আধু-নিক ভারতবর্ষ পরতন্ত্র ও পরাধীন। প্রথমে স্বাতন্ত্র্য ও পার-তন্ত্র্য জন্য যে বৈষম্য ঘটিতেছে, তাহার আলোচনা করা যাউক —পশ্চাৎ স্বাধীনতা ও পরাধীনতার কথা বিবেচনা করা যাইবে। রাজা অন্য দেশবাসী হইলে দুইটী অনিষ্টাপাতের সম্ভা-বনা, প্রথম, রাজা দূরে থাকিলে সুশাসনের বিঘ্ন হয়। দ্বিতীয়, রাজা যে দেশে অধিষ্ঠান করেন সেই দেশের প্রতি তাঁহার অধিক আদর হয়, তাহার মঙ্গলার্থ দূরস্থ রাজ্যের অমঙ্গলও করিয়া থাকেন। এই দুইটী দোষ যে আধুনিক ভারতবর্ষে ঘটিতেছে না, এমত নহে। মহারাণী বিক্টোরিয়ার সিংহাসন দিল্লী বা কলিকাতায় স্থাপিত হইলে, ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্টতর হইত তাহার সন্দেহ নাই, কেন না যাহা রাজার নিকটবর্ত্তী তাহার প্রতি রাজপুরুষদিগের অধিক মনোযোগ হয়। দ্বিতীয় দোষটী ও ঘটিতেছে। ইংলণ্ডের গৌরবার্থ আবিসিনায় যুদ্ধ হইল, ব্যয়ের দায়ী ভারতবর্ষ। "হোমচার্জেস" বলিয়া যে ব্যয় বজেটভুক্ত হয়, তাহার মধ্যে অনেক গুলিই এইরূপ ইংল-ণ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের ক্ষতি স্বীকার। এইরূপ অনেক আছে।

রাজা দূরস্থিত বলিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের সুশাসনের বিঘ্ন ঘটে বটে, কিন্তু তেমন, রাজা স্বেচ্ছাচারী বলিয়া সুশাসনের যে সকল বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা ঘটে না। কোন রাজা,

ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র,—অন্তঃপুরেই বাস করেন, রাজ্য দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল। কোন রাজা নিষ্ঠুর, কোন রাজা অর্থগৃধ্নু। প্রাচীন ভারতবর্ষে এ সকলে গুরুতর ক্ষতি জন্মিত। আধুনিক ভারত-বর্ষে দূরস্থিত রাজা বা রাজ্ঞীর কোন প্রকার দোষ ঘটিলে তাহার ফল, ভারতবর্ষে ফলিবার সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয়, যেমন আধুনিক ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের মঙ্গল কখন কখন নষ্ট হয়, তেমনি প্রাচীন ভারতে রাজার আত্মসুখের জন্য রাজ্যের মঙ্গল নষ্ট হইত। পৃথ্বীরাজ, জয়চন্দ্রের কন্যা হরণ করিয়া আত্মসুখ বিধান করিলেন,তাহাতে উভয়মধ্যে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া,উভয়ের অপ্রীতি ও তেজো-হানি ঘটিতে লাগিল। তন্নিবন্ধন উভয়েই মুসলমানের হস্তে পতিত হইলেন। আধুনিক ভারতবর্ষে দূরবাসী রাজার আত্ম-সুখের অনুরোধে কোন অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু এটি কেবল পরতন্ত্রতা সম্বন্ধে উক্ত হইল, আমরা পরা ধীনতা ও পরতন্ত্রতায় প্রভেদ করিয়াছি। ভারতবর্ষে ইংরে-জের প্রাধান্য, এবং দেশীয় প্রজা সকল তাঁহাদিগের নিকট অবনত, তাঁহাদিগের সুখের জন্য কিয়দংশে যে ভারতবাসী-দিগের সুখের লাঘব ঘটিয়া থাকে,তাহা এ দেশীয় কোন লোকেই অস্বীকার করিবেন না। এরূপ জাতির উপর জাতির প্রাধান্য প্রাচীন ভারতে ছিল না। ছিল না বটে, কিন্তু তত্তুল্য বর্ণ-পীড়ন ছিল। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না, যে চিরকালই ভারতবর্ষের সাধারণ প্রজা শূদ্র; উৎকৃষ্ট বর্ণত্রয় শূদ্রের তুলনায় অল্পসংখ্যক ছিলেন। সেই বর্ণত্রয়ের মধ্যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেশের শাষনকর্ত্তা। কিন্তু এসকল কথা একটু সবিস্তারে লেখা আবশ্যক হইল।

লোকের বিশ্বাস আছে যে প্রাচীন ভারতে কেবল ক্ষত্রিয়ই

রাজা ছিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে, রাজকার্য্য দুই অংশে বিভক্ত ছিল। যুদ্ধাদির ভার ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি ছিল; রাজব্যবস্থা নির্ব্বাচন, বিচার, ইত্যাদি কার্য্যের ভার ব্রাহ্মণের উপর ছিল। এক্ষণে যেমন সিবিল ও মিলিটরি এই দুই অংশে রাজকার্য্য বিভক্ত, তখনকার কর্ম্মভাগ কতকটা সেইরূপই ছিল। ব্রাহ্মণেরা সিবিল কর্ম্মচারী, ক্ষত্রিয়েরা মিলিটরী। এখনও যেমন মিলিটরি অপেক্ষা সিবিল কর্ম্মচারীদিগের প্রাধান্য, তখনও সেইরূপ ছিল; রাজপুরুষদিগের মধ্যে, ক্ষত্রিয়েরাই রাজানাম ধারণ করিতেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাদিগের উপরেও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ছিল। প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয়েরাই সর্ব্বদা রাজা ছিলেন এমত নহে। বোধ হয় আদ্যকালে, ক্ষত্রিয়েরাই রাজা ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধকালে মৌর্য্য প্রভৃতি সঙ্করজাতীয় রাজবংশ দেখা যায়। চীনপরিব্রাজক হোয়েন্থ সাঙ সিন্ধুপারে ব্রাহ্মণ রাজা দেখিয়া গিয়াছিলেন। অন্যত্রও ব্রাহ্মণেরা রাজা নাম ধারণ করিয়াছিলেন। মধ্যকালে অধিকাংশ রাজাই রাজপুত। রাজপুতেরা ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত সঙ্করজাতি মাত্র। ক্ষত্রিয়দিগের প্রাধান্য, প্রাচীন ভারতে চিরকাল অপ্রতিহত ছিল না, ব্রাহ্মণদিগের গৌরব এক দিনের জন্য লঘু হয় নাই। বেদদ্বেষী বৌদ্ধদিগের সময়েও রাজকার্য্য ব্রাহ্মণদিগের হস্ত হইতে অন্য হস্তে যায় নাই—কেন না তাঁহারাই পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, এবং কার্য্যক্ষম। অতএব প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরাই প্রকৃত রূপে রাজপুরুষ পদে বাচ্য। সুবিজ্ঞ লেখক, বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গাল মাগাজিনে একটী প্রবন্ধে যথার্থই লিখিয়াছিলেন, যে ব্রাহ্মণেরাই প্রাচীন ভারতের ইংরেজ ছিলেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে আধুনিক ভারতবর্ষে দেশী বিলাতিতে

যে বৈষম্য, তাহা প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ শূদ্রের বৈষম্যের অপেক্ষা কি গুরুতর?

রাজা ভিন্নজাতীয় হইলে যে জাতিপীড়া জন্মে, তাহা দুই প্রকার ঘটে। এক রাজব্যবস্থাজনিত; আইনে বিধি থাকে যে রাজার স্বজাতীয়গণের পক্ষে এই এই রূপ ঘটিবেক, দেশীয় লোকের পক্ষে অন্য প্রকার ঘটিবেক। দ্বিতীয়, স্বজাতিপক্ষপাতী রাজার ইচ্ছাজনিত; রাজপ্রসাদ, রাজা স্বজাতিকে দিয়া থাকেন এবং তিনি স্বজাতিপক্ষপাতী বলিয়া রাজ্যের কার্য্যে স্বজাতিকেই নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ইংরেজশাসিত ভারতে, এবং ব্রাহ্মণ-শাসিত ভারতে এই দুইটী দোষ কি প্রকার বর্ত্তমান ছিল দেখা যাউক।

১ম। ইংরেজদিগের কৃত রাজব্যবস্থানুসারে, দেশী অপ-রাধীর জন্য এক বিচারালয়, বিলাতী অপরাধীর জন্য অন্য বিচা-রালয়। দেশী লোক ইংরেজ কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু ইংরেজ দেশী বিচারক কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে না। ইহা ভিন্ন ব্যবস্থাগত বৈষম্য আর বড় নাই। কিন্তু ইহা অপেক্ষা কত গুরুতর বৈষম্য ব্রাহ্মণরাজ্যে দেখা যায়! ইংরেজের জন্য পৃথক্ বিচারালয় হউক, কিন্তু আইন পৃথক্ নহে। যেমন একজন দেশীয় লোক ইংরেজ বধ করিলে বধার্হ, ইংরেজ, দেশী লোককে বধ করিলে, আইন অনুসারে সেইরূপ বধার্হ। কিন্তু ব্রাহ্মণ রাজ্যে শূদ্রহন্তা ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণহন্তা শূদ্রের দণ্ডের কত বৈষম্য! কে বলিবে, এ বিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষ নিকৃষ্ট।

ইংরেজের রাজ্যে যেমন ইংরেজ দেশী লোককর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে না, প্রাচীন ভারতেও সেইরূপ ব্রাহ্মণ শূদ্রকর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতে পারিত না। বাবু দ্বারকানাথ মিত্র, প্রধানতম

বিচারালয়ে বসিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন —"রামরাজ্যে" তিনি কোথা থাকিতেন?

২য়। ইংরেজের রাজ্যে রাজপ্রসাদ প্রায় ইংরেজেরই প্রাপ্য কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে দেশীয়েরাও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণ-রাজ্যে শূদ্রদিগের ততটা ঘটিত কি না সন্দেহ। কিন্তু যখন শূদ্র, কখন কখন রাজ সিংহাসনারোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তখন অন্যান্য উচ্চ পদও যে শূদ্রেরা সময়ে সময়ে অধিকৃত করিত তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে আধুনিক ভারতে প্রাথমিক বিচার কার্য্য প্রায় দেশীয় লোকের দ্বারাই হইয়া থাকে,—প্রাচীন ভারতে কি প্রাথমিক বিচার কার্য্য শূদ্রের দ্বারা হইত? আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত অল্পই জানি যে এ কথা স্থির বলিতে পারি না। অনেক বিচার কার্য্য গ্রাম্য সমাজের দ্বারা নির্ব্বাহ হইত বোধ হয়। কিন্তু সাধারণতঃ কি বিচার, কি সৈনাপত্য, কি অন্যান্য প্রধান পদ সকল যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের হস্তে ছিল, তাহা প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠে বোধ হয়।

অনেকেই বলিবেন, ইংরেজের প্রাধান্য এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্যে সাদৃশ্য কল্পনা সুকল্পনা নহে, কেন না ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্রপীড়ক হইলেও স্বজাতি—ইংরেজেরা ভিন্ন জাতি। ইহার এইরূপ উত্তর দিতে ইচ্ছা করে, যে, যে পীড়িত হয়, তাহার পক্ষে স্বজাতির পীড়ন ও ভিন্ন জাতির পীড়ন উভয়ই সমান। স্বজাতীয়ের হস্তে পীড়া কিছু মিষ্ট, পরজাতীয়ের কৃত পীড়া কিছু তিক্ত লাগে, এমত বোধ হয় না। কিন্তু আমরা সে উত্তর দিতে চাহি না। যদি স্বজাতীয়ের কৃত পীড়ায় কাহারও প্রীতি থাকে, তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। আমাদিগের এই মাত্র বলিবার উদ্দেশ্য, যে আধুনিক ভারতের

জাতিপ্রাধান্যের স্থানে প্রাচীন ভারতে বর্ণপ্রাধান্য ছিল। অধিকাংশ লোকের পক্ষে উভয়ই সমান।

তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে পরাধীন ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকে স্বীয়বুদ্ধি, শিক্ষা, বংশ, এবং মর্য্যাদানুসারে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন না। যাহার বিদ্যা এবং বুদ্ধি আছে, তাহাকে যদি বুদ্ধিসঞ্চালনের এবং বিদ্যার ফলোৎপত্তির স্থল না দেওয়া যায়, তবে তাহার প্রতি গুরুতর অত্যাচার করা হয়। আধুনিক ভারতবর্ষে এরূপ ঘটিতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে, বর্ণ বৈষম্য গুণে তাহাও ছিল, কিন্তু এ পরিমাণে ছিল না। আর এক্ষণে রাজকার্য্যাদি সকল ইংরেজের হস্তে —আমরা পরহস্তরক্ষিত বলিয়া নিজে কোন কার্য্য করিতে পারিতেছি না। তাহাতে আমাদিগের রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যপালন বিদ্যা শিক্ষা হইতেছে না—জাতীয় গুণের স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, পরাধীনতা এদিকে উন্নতিরোধক। তেমন, আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করিতেছি। ইউরোপীয় জাতির অধীন না হইলে আমাদিগের কপালে এ সুখ ঘটিত না। অতএব আমাদিগের পরাধীনতার যেমন একদিকে ক্ষতি, তেমন আর একদিকে উন্নতি হইতেছে।

অতএব ইহাই বুঝা যায় যে আধুনিকাপেক্ষা প্রাচীন ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীর লোকের স্বাধীনতাজনিত কিছু সুখ ছিল। কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রায় দুই তুল্য, বরং আধুনিক ভারতবর্ষ ভাল।

তুলনায় আমরা যাহা পাইলাম তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি, অনেকের বুঝিবার সুবিধা হইবে।

১। ভিন্ন জাতীয় রাজা হইলেই রাজ্য পরতন্ত্র বা পরাধীন হইল না।

ভিন্ন জাতীয় রাজার অধীন রাজ্যকেও স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলা যাইতে পারে।

২। স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা, পরতন্ত্রতা ও পরাধীনতা, ইহার আমরা ভিন্ন ভিন্ন পারিভাষিক অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছি। বিদেশনিবাসী রাজাধিকৃত রাজ্য পরতন্ত্র। যেখানে ভিন্ন জাতির প্রাধান্য, সেই রাজ্য পরাধীন। অতএব কোন রাজ্য পরতন্ত্র অথচ পরাধীন নহে। কোন রাজ্য স্বতন্ত্র অথচ স্বাধীন নহে। কোন রাজ্য পরতন্ত্র এবং পরাধীন।

৩। কিন্তু তুলনার উদ্দেশ্য উৎকর্ষাপকর্ষ। যে রাজ্যে লোক সুখী তাহাই উৎকৃষ্ট, যে রাজ্যে লোক দুঃখী তাহাই অপকৃষ্ট। স্বাতন্ত্র্যে ও স্বাধীনতায় প্রাচীন ভারতে প্রজা কি পরিমাণে সুখী এবং পারতন্ত্র্যে ও পরাধীনতায় আধুনিক ভারতে প্রজা কি পরিমাণে দুঃখী তাহাই বিবেচ্য।

৪। প্রথমতঃ স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্য। ইহার অন্তর্গত দুইটি তত্ত্ব। প্রথম, রাজা বিদেশস্থিত বলিয়া ভারতবর্ষের সুশাসনের বিঘ্ন হইতেছে কি না? স্বদেশের মঙ্গলার্থ শাসনকর্ত্তৃগণ এদেশের অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকেন কি না? স্বীকার করিতে হইবে যে তত্তৎকারণে সুশাসনের বিঘ্ন ঘটিতেছে বটে এবং ভারতবর্ষে অমঙ্গল ঘটিতেছে বটে।

কিন্তু রাজার চরিত্র দোষে যে সকল অনিষ্ট ঘটিত, আধুনিক ভারতবর্ষে তাহা ঘটে না। অতএব প্রাচীন বা আধুনিক ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না।

৫। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা ও পরাধীনতা। আধুনিক ভারতবর্ষ প্রভুগণপীড়িত বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতও বড় ব্রাহ্মণপীড়িত ছিল। সে বিষয়ে বড় ইতরবিশেষ নাই। তবে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের একটু সুখ ছিল।

৬। আধুনিক ভারতে কার্য্যগত জাতীয় শিক্ষা লোপ হইতেছে, কিন্তু বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চ্চার অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি হইতেছে।

অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, তবে কি স্বাধীনতা পরাধীনতা তুল্য? তবে পৃথিবীর তাবজ্জাতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করে কেন? যাঁহারা এরূপ বলিবেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের এই নিবেদন যে আমরা সে তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত নহি। আমরা পরাধীন জাতি—অনেক কাল পরাধীন থাকিব—সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের কেবল ইহাই উদ্দেশ্য যে প্রাচীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার হেতু, তদ্বাসিগণ সাধারণতঃ আধুনিক ভারতীয় প্রজাদিগের অপেক্ষা সুখী ছিল কি না? আমরা এই মীমাংসা করিয়াছি, যে আধুনিক ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের অবনতি ঘটিয়াছে, শূদ্র অর্থাৎ সাধারণপ্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে।



প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি।

নারদবাক্য।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে, দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্নচ্ছলে কতকগুলি রাজনৈতিক উপদেশ দিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে রাজনীতি কতদূর উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়া ছিল, উহা তাহার পরিচয়। মুসলমানদিগের অপেক্ষা হিন্দুরা যে রাজনীতিতে বিজ্ঞতর ছিলেন, উহা পাঠ করিলে সংশয় থাকে না। প্রাচীন রোমক এবং আধুনিক ইউরোপীয়গণ ভিন্ন আর কোন জাতি তাদৃশ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষীয় রাজারা যে অন্যান্য সকল জাতির অপেক্ষা অধিক কাল আপনাদিগের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, এই রাজনীতিজ্ঞতা তাহার এক কারণ। হিন্দুদিগের ইতিবৃত্ত নাই; এক একটি শাসনকর্ত্তার গুণগান করিয়া শত শত পৃষ্ঠা লিখিবার উপায় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের কৃত কার্য্যের যে কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেই অনেক কথা বলা যাইতে পারে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সহিত পৃথিবীর যে কোন রাজপুরুষের তুলনা করা যায়। আকবর তাঁহার ন্যায় উত্তর ভারত একচ্ছত্র করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে দুর্দ্ধর্ষ গ্রীক্ জাতির হস্ত হইতে স্বদেশোদ্ধার করিতে হয় নাই। চন্দ্রগুপ্ত আলেক্জণ্ডরের বিজিত ভারতাংশের পুনরুদ্ধার করিয়া, তক্ষশীলা হইতে তাম্রলিপ্তি পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়া, মহতী কীর্ত্তি স্থাপিতা করিয়াছিলেন। ভুবনবিখ্যাত যবন রাজাধিরাজ সিলিউকসকে লাঘব স্বীকার করাইয়া

তাঁহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। (হিন্দু হইয়া ঠিক বিবাহ করিয়াছিলেন এমতও বোধ হয় না—) ইতিহাসে তিনজন সাম্রাজ্যনির্ম্মাতা বিশেষ পরিচিত—শার্লমান, দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক, প্রথম পিটর—ভবিষ্যতে বিস্মার্ক সেই শ্রেণীতে স্থান পাইবেন কি না বলা যায় না, কেন না তাঁহার কীর্ত্তি স্থায়ী কি না তাহা এখনও জানা যায় নাই। আলেক্‌জণ্ডর, নাপোলিয়ন, বা ক্রম্বেল সে শ্রেণীমধ্যে আসন পান নাই, কেন না তাঁহাদের কীর্ত্তি তাঁহাদের মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থায়ী, বা তাহাও নহে। গজননী মহম্মদের প্রায় সেই রূপ। আরবসাম্রাজ্য ও মোগল সাম্রাজ্য এক এক জনের নির্ম্মিত নহে। কিন্তু মাগধ সাম্রাজ্য একা চন্দ্রগুপ্তের নির্ম্মিত। এবং পুরুষানুক্রমে স্থায়ী বটে। তিনি শার্লমান, ফ্রেডরিক ও পিটরের সঙ্গে উচ্চাসনে বসিতে পারেন।

নারদের যে উপদেশবাক্যের কথার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে এমত তত্ত্ব অনেক আছে, যে রাজনীতিবিশারদ ইংরেজেরাও তাহা গ্রহণ করিয়া তদনুসারে চলিলে, তাঁহাদিগের উপকার হয়। এমত কদাচ বক্তব্য নহে যে হিন্দুরা এই সকল নৈতিক উক্তির অনুসারী হইয়া সর্ব্বত্র সর্ব্ব প্রকারে চলিতেন। কিন্তু ঈদৃশ নৈতিকতত্ত্ব যে তাঁহাদিগের দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। যেখানে উদ্ভূত হইয়াছিল, সেখানে যে উহা কিয়দংশে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সংশয় করা অন্যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজনীতির কতদূর উন্নতি হইয়াছিল,তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে ক্ষতি নাই। এজন্য আমরা উল্লিখিত নারদবাক্য হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব। ঐ কথা পাঠকেরা অনেকেই পড়িয়াছেন,তথাপি উহার পুনঃপাঠে কষ্ট বোধ হইবে, এমন বিবেচনা হয় না।

নারদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "মহারাজ! কৃষি, বণিজ্য, দুর্গসংস্কার, সেতুনির্ম্মাণ, আয়ব্যয় শ্রবণ, পৌরকার্য্য দর্শন ও জনপদ পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি অষ্টবিধ রাজকার্য্য ত সম্যক্ প্রকারে সম্পাদিত হয়? * * নিঃশঙ্কচিত্ত কপট দূতগণ ত তোমার বা তোমার অমাত্যদিগের গূঢ়মন্ত্রণাসকল ভেদ করিতে পারে না? মিত্র, উদাসীন ও শত্রুদিগের অভিসন্ধি সমস্ত আপনি ত বুঝিয়া থাকেন? যথাকালে সন্ধিস্থাপনে ও বিগ্রহবিধানে প্রবৃত্ত হয়েন? উদাসীন ও মধ্যমের প্রতি ত মাধ্যস্থ ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন? আত্মানুরূপ, বৃদ্ধ, বিশুদ্ধস্বভাব, সম্বোধনক্ষম সৎকুলজাত, অনুরক্ত ব্যক্তিগণ মন্ত্রিপদে ত অভিষিক্ত হইয়া থাকেন?"

সর জর্জ কাম্বেল সাহেব "আত্মানুরূপ" ব্যক্তিকে স্বীয় মন্ত্রিত্বে বরণ করিয়াছেন বলিয়া দেশের লোক তাঁহার উপর রাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বলিতে পারিতেন যে নারদবাক্য আমার পক্ষে। আধুনিক ভারতীয় শাসনকর্ত্তাদিগের দুরদৃষ্ট এই যে বৃদ্ধ মন্ত্রী তাঁহাদিগের কপালে প্রায় ঘটে না। কিন্তু ইউরোপে নারদীয় বাক্য প্রতিপালিত হইয়া থাকে—বিস্মার্ক, গ্লাডষ্টোন, ডিস্রেলি, টিয়র, প্রভৃতি উদাহরণ। পরে,—

"একাকী বা বহুজনপরিবৃত হইয়া ত মন্ত্রণা করেন না? মন্ত্রিত মন্ত্র ত জনপদ মধ্যে অপ্রচলিত থাকে?"

ইংরেজেরা এই নীতির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন, কেবল অতিরিক্ত এই বলেন, যে "মন্ত্রণাবিশেষ জনপদ মধ্যে প্রচার হওয়াই ভাল। অতএব সেই গুলি বাছিয়া বাছিয়া গেজেটে ছাপাই।" পরে—

"স্বল্পায়াসসাধ্য মহোদয় বিষয় সকল ত শীঘ্রই সম্পন্ন করিয়া থাকেন?"

আমাদিগের অনুরোধ যে প্রাচীন ঋষির এই বাক্য ইংরেজেরা

স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া কার্য্যালয়ে কার্য্যালয়ে প্রকটিত করুন। তৎপরে,—

"কৃষীবলেরা আপনার পরোক্ষে প্রকৃত ব্যবহার করিয়া থাকে? কারণ প্রভুর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ না থাকিলে এরূপ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব সন্দেহ নাই।"

বিলাতী শাসনকর্ত্তা কিম্বা তাঁহাদিগের দেশী সমালোচক, কেহই অদ্যাপি এ কথার সারবত্তা অনুভূত করিতে সক্ষম হইলেন না। তৎপরে—

"অনারব্ধ কার্য্যের, পরীক্ষার্থ ধর্ম্মজ্ঞ শাস্ত্রকোবিদ বিচক্ষণ পরীক্ষক সকল ত নিযুক্ত করিয়া থাকেন?"

ইংরেজেরা এই কথার সম্যক্‌প্রকারে অনুবর্ত্তী। সকল কার্য্যের পূর্ব্বেই কমিটি নিযুক্ত হইয়া থাকে। সকল কার্য্য করিবার পূর্ব্বে ইংরেজেরা এক একটা কমিটী নিযুক্ত করেন কেন? এ কথা যিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহাকে দেয় উত্তর উল্লিখিত নারদবাক্যে আছে। তৎপরে—

"সহস্র মূর্খ বিনিময় দ্বারা এক জন পণ্ডিতকে ত ক্রয় করিয়া থাকেন?"

আমরা এই কথাটির অনুমোদন করি না। মূর্খের দ্বারাই পৃথিবীর কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে—পণ্ডিত কোন কাজে লাগে? মিল পার্লিমেণ্টে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না,—ওয়েষ্টমিনষ্টর কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। লাপ্লাসকে বোনাপার্টি পণ্ডিত দেখিয়া উচ্চপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন—কিন্তু লাপ্লাস কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম হইয়া দূরীভূত হইলেন। প্রবাদ আছে, একজন ভট্টাচার্য্য বন্ধ্যা ভার্য্যার বিনিয়মে দুগ্ধবতী গো লইয়া আসিয়াছিলেন। সেইরূপ রাজপুরুষেরা অপ্রিয়বাদী, আত্মমতভক্ত, পণ্ডিতের বিনিময়ে আজ্ঞাকারী মূর্খই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

নারদ বলিয়াছেন বটে, যে"কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পণ্ডিতব্যক্তি অনায়াসে তাহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হয়েন।" এ কথা সত্য বটে, ; অতএব বিপদকালে পণ্ডিতের আশ্রয় লইবে। সুখের দিনে মূর্খ ;—দুঃখের দিনে পণ্ডিত।

পরে নারদ বলিতেছেন, "দুর্গ সকল ত ধন ধান্য উদক যন্ত্রে পরিপূর্ণ রাখিয়াছেন। তথায় শিল্পিগণ ও ধনুর্দ্ধর পুরুষ সকল ত সর্ব্বদা সতর্কতা পূর্ব্বক কালযাপন করে?"

মিউটিনির পূর্ব্বে ইংরেজেরা যদি এই কথা স্মরণ রাখিতেন তবে তাদৃশ বিপদ ঘটিত না। সর হেনরি লরেন্স এই কথা বুঝিতেন, বলিয়া লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সির রক্ষা হইয়াছিল।

"প্রচণ্ড দণ্ড বিধান দ্বারা প্রজাদিগকে ত অত্যন্ত উদ্বেজিত করেন না?"

ইউরোপীয়েরা অতি অল্পকাল হইল, এ কথা শিখিয়াছেন। এক পয়সা চুরীর জন্য প্রাণদণ্ড প্রভৃতি প্রচণ্ড দণ্ড, অতি অল্পকাল হইল, ইংলণ্ড হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

"নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেনাদিগের বেতনাদি প্রদানে ত বিমুখ হয়েন না? তাহা হইলে সুচারুরূপে কার্য্যনির্ব্বাহ হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহাদিগের দ্বারা পদে পদে অনিষ্ট ঘটনা ও বিদ্রোহের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠে।"

এই নীতির বিপরীতাচরণ কার্থেজ রাজ্য লোপের মূল। একা রোম কার্থেজ ধ্বংস করে নাই।

"সৎকুলজাত প্রধান প্রধান লোক ত তোমার প্রতি অনুরক্ত রহিয়াছে? তাহারা ত তোমার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও সম্মত আছে?"

এই নীতির অবজ্ঞায় ষ্টুয়ার্ট বংশ নষ্ট হয়েন। ভারতবর্ষীয় ইংরেজ রাজপুরুষেরা ইহা বিলক্ষণ বুঝেন। বুঝিয়া, কর্ণওয়া-

লিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, ও কানিং ভারতীয় রাজগণকে পোষ্যপুত্র লইতে অনুমতি দিয়াছেন। লর্ড লিটন আর কিছু করিতে না পারিয়া উপাধি বিতরণ করিয়াছেন।

পরে, নারদ পেনশ্যন দেওয়ার পরামর্শ দিতেছেন,

"মহারাজ! যাহারা কেবল আপনার উপকারের নিমিত্ত কালকবলে নিপতিত ও যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পুত্র কলত্র প্রভৃতিকে ত ভরণপোষণ করিতেছেন?"

ক্ষিপ্রকারিতার বিষয়ে—

"শত্রুকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়া স্বীয় মন্ত্র কোষ ও ভৃত্য, ত্রিবিধ বল সম্যক্ বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে তাহাকে ত আক্রমণ করেন?"

অতি প্রধান রাজ্যাধ্যক্ষেরা এ তত্ত্ব সম্যক্ বুঝিয়াছিলেন। "অবিলম্বে" কাহাকে বলে প্রথম নাপোলিয়ন বুঝিতেন। তাঁহার রণজয় সেই বুদ্ধির ফল। তৃতীয় নাপোলিয়ন "অবিলম্বে" প্রুসীয়দিগকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রথম নাপোলিয়নের মত "মন্ত্র কোষ ও ভৃত্য" ত্রিবিধ বলের সম্যক্ বিচার না করিয়াই আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি, নারদ্য বাক্যে অবহেলা করিয়া নষ্ট হইলেন।

পরে সমদৃষ্টি পক্ষে,—

"যেমন পিতা মাতা সকল সন্তানকে সমান স্নেহ করেন, তদ্রূপ আপনি ত সমদৃষ্টিতে সমুদ্রমেখলা সমুদয় পৃথিবী অবলোকন করিতেছেন?"

ইংরেজেরা ভারতবর্ষে এই নারদীয় বাক্য মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করুন।

নিম্নলিখিত কথাটি বিস্মার্কের যোগ্য;—

"সৈন্যদিগের ব্যবসায় ও জয়লাভসামর্থ্য বুঝিয়া তাহা-

দিগকে ত অগ্রিম বেতন প্রদান পূর্ব্বক উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধে যাত্রা করিয়া থাকেন ?"

নিম্নলিখিত কথাটির আমরা অনুমোদন করি না, কিন্তু চতুর্দ্দশ লুই শুনিলে অনুমোদন করিতেন,—

"পরস্পরের ভেদ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত শত্রুপক্ষীয় প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে ত যাথাযোগ্য ধনদান করেন ?"

নিম্নলিখিত কথাগুলি গ্রেগরি বা ইগ্নেশ্যাস লয়লার যোগ্য—

"স্বয়ং জিতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মপরাজয় পূর্ব্বক, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র প্রমত্ত বিপক্ষ দিগকে ত পরাজয় করিতেছেন ?"

পরে,—

"বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণ কালে আপন অধিকার ত দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত করেন ?"

পৃথিবীতে যত সৈনিক জন্মিয়াছেন, তন্মধ্যে হানিবল এক জন অত্যুৎকৃষ্ট। কিন্তু তিনি এই কথা বিস্মৃত হওয়াতে, সব হারাইয়া ছিলেন। তিনি যখন ইতালিতে অনিবার্য্য, সিপিও তখন আফ্রিকাতে সৈন্য লইয়া গিয়া তাঁহার কৃত রণজয় সকল বিফল করিয়াছিলেন।

"এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুনর্ব্বার স্ব স্ব পদে ত প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন ?"

রোমকেরা ইহা করিতেন, এবং ভারতবর্ষে ইংরেজেরা ইহা করেন। এই জন্য এতদুভয় সাম্রাজ্য ঈদৃশ বিস্তার লাভ করিয়াছে।

নিম্নলিখিত তিনটী বাক্যে সমুদায় রাজকার্য্য নিঃশেষে বর্ণিত হইয়াছে—

"আপনি ত আভ্যন্তরিক ও বাহ্যজনগণ হইতে আপনাকে,

আত্মীয়লোক হইতে তাহাদিগকে, এবং পরস্পর হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকেন ?"

তাহার পর বজেট ও এষ্টিমেটের কথা—

"আয় ব্যয় নিযুক্ত গণক ও লেখকবর্গ আপনার আয় সকল পূর্ব্বাহ্নে ত নিরূপণ করিতেছে ?"

আমরা জানিতাম এটী ভারতবর্ষে উইলসন সাহেবের সৃষ্টি; কিন্তু তাহা নহে।

পরে—

"রাজ্যস্থ কৃষকেরা ত সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছে ?"

এই কথা, নারদ যেমন যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমরা তেমনি ভারতবর্ষীয় রাজপ্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করি।

অনেকের বোধ আছে, "ইরিগেশ্যন ডিপার্টমেণ্ট"টী ভারতবর্ষে একটী নূতন কাণ্ড দেখাইতেছে। তাহা নহে। নারদ বলিতেছেন—

"রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবর সকল ত নিখাত হইয়াছে ? কৃষিকার্য্য ত বৃষ্টিনিরপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতেছে ?"

একথা ইংরেজদিগের মনে থাকিলে উড়িষ্যাদিতে দুর্ভিক্ষ ঘটিত না।

নিম্নলিখিত বাক্যটির প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ করিলে আমাদিগের বিবেচনায় ভাল হয়।

"কৃষকদিগের গৃহে বীজও অন্নাদির ত অসদ্ভাব নাই ? আবশ্যক হইলে ত পাদিক বৃদ্ধিতে অনুগ্রহ স্বরূপ শত সংখ্যক ঋণ দান করিয়া থাকেন ?"

এক্ষণে এই নিয়মের অভাবে এ দেশের কৃষকেরা মহাজনের নিকট বিক্রীত। মহাজনের নিকটেও সকলে সকল সময়ে পায়

না—অনেকেই অন্নাভাবে শীর্ণ—বীজাভাবে ভরসাশূন্য। যে পায় সেও দ্বিপাদ বৃদ্ধিতে নহিলে পায় না। অনেকে বলিবেন যে, যে অর্থশাস্ত্র অনবগত সেই রাজাকে মহাজনি করিতে পরামর্শ দিবে—রাজার ব্যবসায়, সমাজের অনিষ্টকারক। অর্থশাস্ত্রঘটিত যে আপত্তি তাহা আমরা অবগত আছি এবং মহাভারতকারও অবগত ছিলেন। এই জন্যই নারদের ঐ বাক্যমধ্যেই তিনটী গুরুতর নিয়ম সন্নিবিষ্ট আছে। প্রথম—"আবশ্যক হইলে" ঋণ দিতে বলিতেছেন—ইহার অর্থ যে যাহাকে না দিলে চলে না তাহাকেই দিবেন। অতএব যে মহাজনের নিকট ঋণ পাইতে পারিবে, তাহাকে ঋণ দেওয়া এই কথায় প্রতিষিদ্ধ হইল। সুতরাং রাজা ব্যবসায়ী হইলেন না। যাহাকে রাজা না দিলে সে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে, তাহাকেই দিবেন। দ্বিতীয়তঃ "অনুগ্রহ স্বরূপ" দিবেন—অর্থাৎ ব্যবসায়ীর ন্যায় লাভাকাঙ্ক্ষায় দিবেন না। তবে পাদিক বৃদ্ধির কথা কেন? এ নিয়ম না করিলে যে সে নিষ্প্রয়োজনেও ঋণ লইবার সম্ভাবনা—বঞ্চক জাতি সর্ব্বত্রই আছে। আর ঋণ দিলেই কতক আদায় হয়, কতক আদায় হয় না। যদি বৃদ্ধির নিয়ম না থাকে তবে রাজাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ক্ষতি স্বীকার করিয়া রাজাকোষ হইতে ঋণ দিতে হইলে রাজ্য চলা ভার। তৃতীয়তঃ "শতসংখ্যক" ঋণ দিবে—ইহার ঊর্দ্ধ দিবে না। অর্থাৎ প্রজার জীবননির্ব্বাহার্থে যে পর্য্যন্ত প্রয়োজন, তাহাই রাজা ঋণস্বরূপ দিতে পারেন। ততোধিক ঋণদান ব্যবসায়ীর কাজ। এই তিনটী নিয়মের দ্বারা অর্থশাস্ত্রবেত্তাদিগের আপত্তির মীমাংসা হইতেছে। প্রাচীন হিন্দুরা অর্থশাস্ত্র বিলক্ষণ বুঝিতেন।

নিম্নোদ্ধৃত নীতি, ইংরেজেরা এপর্য্যন্ত শিখিলেন না। না শিখাতে তাঁহাদিগের ক্ষতি হইতেছে;—

"হে মহারাজ! যথাকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বেশভূষা সমাধান করিয়া কালজ্ঞ মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া দর্শনার্থী প্রজাগণকে ত দর্শন প্রদান করেন?"

যে রাজাকে প্রজাগণ কখন দেখিতে পায় না—তাঁহার প্রতি প্রজাদিগের অনুরাগ সঞ্চার হয় না। বিশেষতঃ এদেশের লোকের স্বভাব এই। আর রাজদর্শন প্রজাগণের দুর্লভ হইলে, তাহাদিগের সকল প্রকার দুঃখ ও প্রকৃত অবস্থা রাজা বা রাজপুরুষেরা কখন জানিতে পারেন না।

হিন্দুরাজাদিগের ন্যায় মুসলমানেরাও এ কথা বুঝিতেন। এখন যেখানে সম্বৎসরে একটা দরবার বা "লেবী" হয়, সেখানে হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রাত্যহিক দরবার হইত।

পরে,—

"দুর্ব্বল শত্রুকে ত বলপ্রকাশপূর্ব্বক সাতিশয় পীড়িত করেন না?"

তাহা হইলে দুর্ব্বল শত্রুও বলবান্ হইয়া উঠে। এই দোষে, স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ "নিম্নদেশ" অর্থাৎ বেলজম হলাণ্ড হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ড যে আমেরিক উপনিবেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তাহারও কারণ প্রায় এই রূপ।

তৎপরে,

"দুষ্ট অহিতকারী কদর্য্যস্বভাব দণ্ডার্হ তস্কর লোপ্ত্রসহ গৃহীত হইয়াও তাহাদিগের নিকটে ত ক্ষমা লাভ করিয়া থাকে না?"

যে দেশে জুরির বিচার আছে, সে দেশের রাজপুরুষদিগকে আমরাও একথা জিজ্ঞাসা করি।

নারদ যে চতুর্দ্দশ রাজদোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহাও শ্রবণযোগ্য,—যথা,

"নাস্তিক্য, অনৃত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদিগের সাক্ষাৎকার ত্যাগ, আলস্য, চিত্তচাপল্য, নিরন্তর অর্থচিন্তা, অনর্থজ্ঞ ব্যক্তির সহিত পরামর্শ, নিশ্চিত বিষয়ের অনারম্ভ, মন্ত্রণার অপরিরক্ষণ, মঙ্গল কার্য্যের অপ্রয়োগ ও প্রত্যুত্থান, এই চতুর্দ্দশ রাজদোষ।"

আর একটী বাক্যমাত্র উদ্ধৃত করিয়া আমরা নিরস্ত হইব—

"অন্ধ, মূক, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বন্ধুবিহীন, প্রব্রজিত, ব্যক্তিদিগকে ত পিতার ন্যায় প্রতিপালন করেন?"

এই প্রকার সারবান্ এবং একালেও আদরণীয় কথা আরও অনেক আছে। দুই একটা ভণ্ডামিও আছে—উদাহরণ স্বরূপ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

"সুস্বাদ অন্নপান্ দ্বারা গুণবান ব্রাহ্মণদিগকে ত ভোজন করাইয়া দক্ষিণা প্রদান করিয়া থাকেন? একাগ্রচিত্ত হইয়া ত বাজপেয় ও পুণ্ডরীক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হইয়া থাকেন? গুরুজন, বয়োবৃদ্ধ জ্ঞাতি, দেবতা, তাপসগণ, চৈত্যবৃক্ষ, ও শুভফলপ্রদ ব্রাহ্মণদিগকে ত নমস্কার করিয়া থাকেন? * * লোক সকল ত মাঙ্গল্য বস্তু লইয়া আপনার পার্শ্বে অবস্থিতি করে?"



প্রাচীনা এবং নবীনা।

আমাদিগের সমাজসংস্কারকেরা, নূতন কীর্ত্তি স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের গতি পর্য্যবেক্ষণায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন। "এই হইলে ভাল হয়, অতএব এই কর," ইহাই তাঁহাদিগের উক্তি, কিন্তু কি করিতে কি হইতেছে, তাহা কেহ দেখেন না। বাঙ্গালিরা যে ইংরেজি শিখে, ইহাতে সকলেরই উৎসাহ। কিন্তু ইহার ফল কি তাহার সমালোচনা কেবল আজি কালি হইতেছে। এক শ্রেণীর লোক বলেন, ইহার ফল মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বলেন, দুই একটী ফল সুপক্ক এবং সুমধুর বটে, কিন্তু অধিকাংশ তিক্ত ও বিষময়—উদাহরণ মাতালের দল এবং সাধারণ বাঙ্গালী লেখকের পাল। আবার দিন কত ধূম পড়িল, স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার সংস্কার কর, স্ত্রী শিক্ষা দাও, বিধবাবিবাহ দাও, স্ত্রীলোককে গৃহপিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া উড়াইয়া দাও, বহুবিবাহ নিবারণ কর; এবং অন্যান্য প্রকারে পাঁচী রামী মাধীকে বিলাতি মেম করিয়া তুল। ইহা করিতে পারিলে যে ভাল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু পাঁচী যদি কখন বিলাতি মেম হইতে পারে, তবে আমাদিগের শালতরুও এক দিন ওক্‌বৃক্ষে পরিণত হইবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে। যে রীতিগুলির চলন আপাততঃ অসম্ভব, সে গুলি চলিত হইল না; স্ত্রীশিক্ষা সম্ভব, এ জন্য তাহা এক প্রকার প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। পুস্তক হইতে এক্ষণে বাঙ্গালী স্ত্রীগণ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা অতি সামান্য; পরিবর্ত্তনশীল সমাজে অবস্থিতি জন্য অর্থাৎ শিক্ষিত এবং ইংরেজের অনুকরণকারী পিতা ভ্রাতা

স্বামী প্রভৃতির সংসর্গে থাকায় তাহারা যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, তাহা প্রবলতর। এই দ্বিবিধ শিক্ষার ফল কিরূপ দাঁড়াইতেছে? বাঙ্গালী যুবকের চরিত্রে যেরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালী যুবতীগণের চরিত্রে সেরূপ লক্ষণ কিছু দেখা যাইতেছে কি না? যদি দেখা যাইতেছে, সে গুলি ভাল না মন্দ? তাহার উৎসাহদান বিধেয়, না তাহার দমন আবশ্যক? এ সকল প্রশ্ন সাধারণ লেখকদিগকে আলোচনা করিতে আমরা প্রায় দেখিতে পাই না, অথচ, ইহার অপেক্ষা গুরুতর সামাজিক তত্ত্বও আর নাই। তাই বলিতেছিলাম, যে আমাদিগের সমাজ-সংস্কারকেরা নূতন কীর্ত্তি স্থাপনে যাদৃশ ব্যগ্র, সমাজের বর্ত্তমান গতির আলোচনায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন।

বিষয়টি অতি গুরুতর। সমাজে স্ত্রীজাতির যে বল, তাহা বর্ণিত করিবার প্রয়োজন নাই। মাতা বাল্যকালের শিক্ষাদাত্রী, স্ত্রী বয়ঃপ্রাপ্তের মন্ত্রী, ইত্যাদি প্রাচীন কথা পুনরুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। সকলেই জানেন, স্ত্রীলোকের সম্মতি এবং সাহায্য ব্যতীত সংসারের কোন গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হয় না। গহনা গড়ান ও গোরু কেনা হইতে ফরাসিস্ রাজ্যবিপ্লব এবং লুথরের ধর্ম্মবিপ্লব পর্য্যন্ত সকলেই স্ত্রীসাহায্যসাপেক্ষ। ফরাসিস স্ত্রীগণ ফরাসিস রাজ্যবিপ্লবে মহারথী ছিলেন। আন বলীন হইতে ইংলণ্ড প্রটেষ্টাণ্ট—

—Gospel light first dawned
from Bullen's eyes:—

ইহা বলা যাইতে পারে যে আমাদের শুভাশুভের মূল আমাদের কর্ম্ম, কর্ম্মের মূল প্রবৃত্তি; এবং অনেক স্থানেই আমাদিগের প্রবৃত্তি সকলের মূল আমাদিগের গৃহিণীগণ। অতএব স্ত্রীজাতি আমাদিগের শুভাশুভের মূল। স্ত্রীজাতির

মহত্ত্ব কীর্ত্তন কালে, এই সকল কথা বলা প্রাচীন প্রথা আছে এজন্য আমরাও এ কথা বলিলাম; কিন্তু এ কথা গুলি যাঁহারা ব্যবহার করেন তাঁহাদিগের অন্তরিক ভাব এই যে পুরুষই মনুষ্যজাতি; যাহা পুরুষের পক্ষে শুভাশুভ বিধান করিতে সক্ষম, তাহাই গুরুতর বিষয়; স্ত্রীগণ, পুরুষের শুভাশুভ বিধায়িনী বলিয়াই তাঁহাদিগের উন্নতি বা অবনতির বিষয় গুরুতর বিষয়। বাস্তবিক, আমরা সেরূপ কথা বলি না। আমাদিগের প্রধান কথা এই, যে স্ত্রীগণ সংখ্যায় পুরুষগণের তুল্য, বা অধিক; তাঁহারা সমাজের অর্দ্ধাংশ। তাঁহারা পুরুষগণের শুভাশুভবিধায়িনী হউন, বা না হউন, তাঁহাদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি; যেমন পুরুষদিগের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, ঠিক সেই পরিমাণে স্ত্রীজাতির উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, কেন না স্ত্রীজাতি সমাজের অর্দ্ধেক ভাগ। স্ত্রী পুরুষের সমান ভাগের সমষ্টিকে সমাজ বলে; উভয়ের সমান উন্নতিতে সমাজের উন্নতি। এক ভাগের উন্নতি সমাজসংস্করণের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহার উন্নতিসহায় বলিয়াই অন্যভাগের উন্নতি গৌণ উদ্দেশ্য, এ কথা নীতিবিরুদ্ধ।

কিন্তু সমাজের নিয়ন্তৃবর্গ সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে, এই ভ্রমে পতিত। তাঁহারা বিধান করেন যে স্ত্রীলোকেরা এইরূপ এইরূপ আচরণ করিবে।—কেন করিবে? উত্তর, তাহা হইলে, পুরুষের অমুক মঙ্গল ঘটিবে, বা অমুক অমঙ্গল নিবারিত হইবে। সমাজবিধাতৃদিগের সর্ব্বত্র এইরূপ উক্তি; কোথাও এ উদ্দেশ্য স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট, কিন্তু সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। এই জন্যই সর্ব্বত্র স্ত্রীজাতির সতীত্বের জন্য এত পীড়াপীড়ি; পুরুষের সেই ধর্ম্মের অভাব, কোথাও তত বড় গুরুতর দোষ বলিয়া গণনীয় নহে। বাস্তবিক নীতিশাস্ত্রের স্বাভাবিক মূল ধরিতে গেলে

এমত কোন বিষয়ই পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা স্ত্রীকৃতব্যভিচার পুরুষকৃত পরদারগ্রহণ অপেক্ষা গুরুতর দোষ বিবেচনা করা যায়। পাপ দুই সমান। এক পুরুষভাগিনী স্ত্রীতে পুরুষের যে স্বাভাবিক অধিকার, এক স্ত্রীভাগী পুরুষে স্ত্রীলোকের ঠিক সেই স্বাভাবিক অধিকার, কিছু মাত্র ন্যূন নহে। তথাপি পুরুষে এ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, তাহা বাবুগিরি মধ্যে গণ্য; স্ত্রীলোক এ দোষ করিলে, সংসারের সকল সুখ তাহার পক্ষে বিলুপ্ত হয়; সে অধমের মধ্যে অধম বলিয়া গণ্য হয়, কুষ্ঠগ্রস্তের অধিক অস্পৃশ্যা হয়। কেন? পুরুষের সুখের পক্ষে স্ত্রীর সতীত্ব আবশ্যক। স্ত্রীজাতির সুখের পক্ষেও পুরুষের ইন্দ্রিয় সংযম আবশ্যক, কিন্তু পুরুষই সমাজ, স্ত্রীলোক কেহ নহে। অতএব স্ত্রীর পাতিব্রত্যচ্যুতি গুরুতর পাপ বলিয়া সমাজে বিহিত হইল; পুরুষের পক্ষে নৈতিক বন্ধন শিথিল রহিল।

সকল সমাজেই স্ত্রীজাতি পুরুষাপেক্ষা অনুন্নত; পুরুষের আত্মপক্ষাতিতাই ইহার কারণ। পুরুষ বলিষ্ঠ, সুতরাং পুরুষই কার্য্যকর্ত্তা; স্ত্রীজাতিকে কাজে কাজেই তাঁহাদিগের বাহুবলের অধীন হইয়া থাকিতে হয়। আত্মপক্ষপাতী পুরুষগণ, যতদূর আত্মসুখের প্রয়োজন, ততদূর পর্য্যন্ত স্ত্রীগণের উন্নতির পক্ষে মনোযোগী; তাহার অতিরেকে তিলার্দ্ধ নহে। এ কথা অন্যান্য সমাজের অপেক্ষা আমাদিগের দেশে বিশেষ সত্য। প্রাচীন কালের কথা বলিতে চাহি না; তৎকালীন স্ত্রীজাতির চিরাধীনতার বিধি; কেবল অবস্থা বিশেষ ব্যতীত স্ত্রীগণের ধনাধিকারে নিষেধ; স্ত্রী, ধনাধিকারিণী হইলেও স্ত্রীর দান বিক্রয়ে ক্ষমতার অভাব; সহমরণ বিধি; বহু কাল প্রচলিত বিধবার বিবাহ নিষেধ; বিধবার পক্ষে প্রচলিত কঠিন নিয়ম সকল, স্ত্রীপুরুষে গুরুতর বৈষম্যের প্রমাণ। তৎপরে মধ্যকালেও স্ত্রীজাতির

অবনতি আরও গুরুতর হইয়াছিল। পুরুষ প্রভু, স্ত্রী দাসী; স্ত্রী জল তুলে, রন্ধন করে, বাটনা বাটে, কুটনা কোটে। বরং বেতনভাগিনী দাসীর কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বনিতা দুহিতা স্বসার তাহাও ছিল না। আজি কালি, পুরুষের শিক্ষার গুণে হউক, স্ত্রীশিক্ষার গুণে হউক, বা ইংরেজের দৃষ্টান্তের গুণে হউক, এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু যেরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহার সর্ব্বাংশই কি উন্নতিসূচক? বঙ্গীয় যুবকদিগের যে অবস্থান্তর ঘটিতেছে তাহার বিশেষ আন্দোলন শুনিতে পাই, কিন্তু বঙ্গীয় যুবতীগণের যে অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহা কি উন্নতি?

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বকালে বঙ্গীয়া যুবতী কি ছিলেন, এক্ষণে কি হইতেছেন, তাহা স্মরণ করা আবশ্যক। প্রাচীনার সহিত নবীনার তুলনা আবশ্যক। পূর্ব্বকালের যুবতীগণের নাম করিতে গেলে, আগে শাঁখা শাড়ী সিন্দুরকৌটা মনে পড়িবে; বাঁকমলের মুটাম হাত উপরে মনসা পেড়ে শাড়ীর রাঙ্গা পাড় আসিয়া পড়িয়াছে; হাতে পৈছা, কঙ্কণ, এবং শংখ, (যাহার জুটিল তাহার বাউটি নামে সোনার শংখ)—মুষ্টিমধ্যে দৃঢ়ধৃত সম্মার্জ্জনী, বা রন্ধনের বেড়ী; কপালে, কলা বউয়ের মত সিন্দুরের রেখা, নাকে চন্দ্রমণ্ডলের মত নথ; দাঁতে অমাবস্যার মত মিশি; এবং মস্তকের ঠিক মধ্যভাগে, পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় তুঙ্গ কবরীশিখর। আমরা স্বীকার করি যে সেকেলে মেয়ে যখন গাছকোমর বাঁধিয়া, ঝাঁটা হাতে খোঁপা খাড়া করিয়া, নথ নাড়িয়া, দাঁড়াইত, তখন অনেক পুরুষের হৃৎকম্প হইত। যাঁহারা এবম্বিধা প্রাঙ্গণবিহারিণী রসবতীর সঙ্গে বানানুবাদ সাহস করিতেন, তাঁহারা একটু সতর্ক হইয়া দূরে দাঁড়াইতেন। ইঁহারা কোন্দলে বিশেষ

পরিপক্ক ছিলেন, পরস্পরের পৃষ্ঠত্বগের সঙ্গে তাঁহাদের হস্তের সম্মার্জ্জনীর বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল। তাঁহাদিগের ভাষাও যে বিশেষ প্রকারে অভিধানসম্মত ছিল, এমত বলিতে পারি না, কেন না তাঁহারা "পোড়ার মুখো" "ডেক্‌রা" ইত্যাদি নিপাতন-সাধ্য শব্দ আধুনিক প্রাণনাথ প্রাণকান্তাদির স্থলে ব্যবহার করিতেন, এবং "আবাগী" "শতেক খুয়ারী" প্রভৃতি শব্দ আধুনিক "সখী" "ভগিনী" স্থানে প্রয়োগ করিতেন।

এক্ষণে যে সুন্দরীকুল চরণালক্তকে বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বলা করিতেছেন, তাঁহারা ভিন্নপ্রকৃতি। সে শাঁখা শাড়ী সিন্দুর মিশি মল মাদুলী, কিছুই নাই; অনাভিধানিক প্রিয় সম্বোধন সকল সুন্দরীগণের রসনা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা নাটকে আশ্রয় লইয়াছে; যেখানে আগে মোটা মনসা পেড়ে শাড়ী মেয়ে মোড়া গনিক্লাথ ছিল, এক্ষণে তাহার স্থানে শান্তিপুরে ডুরে রূপের জাহাজের পাল হইয়া সোহাগ বাতাসে ফরফর করিয়া উড়িতেছে। হাতাবেড়ী ঝাঁটা কলসীর পরিবর্ত্তে, সূচ সূতা কার্পেট কেতাব হইয়াছে; পরিধেয় আটু ছাড়িয়া চরণে নামিয়াছে; কবরী মুর্দ্ধা ছাড়িয়া স্কন্ধে পড়িয়াছে; এবং অঙ্গের সুবর্ণ পিণ্ডত্ব ছাড়িয়া, অলঙ্কারে পরিণত হইতেছে। ধূলিকর্দ্দম-রঙ্গিণীগণ, সাবান সুগন্ধাদির মহিমা বুঝিয়াছেন; কলকণ্ঠধ্বনি, পাপিয়ার মত গগনপ্লাবী না হইয়া মার্জ্জারের মত অস্ফুট হইয়াছে। পতির নাম এক্ষণে আর ডেক্‌রা সর্ব্বনেশে নহে; তত্তৎস্থানে সম্বোধন পদ সকল দীনবন্ধু বাবুর গ্রন্থ হইতে বাছিয়া বাছিয়া নীত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। স্থূল কথা এই, প্রাচীনার অপেক্ষা নবীনার রুচি কিছু ভাল। স্ত্রীজাতির রুচির কিছু সংস্কার হইয়াছে।

কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে, তাদৃশ উন্নতি হইয়াছে কি না বলিতে

পারি না। কয়েকটি বিষয়ে নবীনাগণকে আমরা নিন্দনীয়া বিবেচনা করি। তাঁহাদিগের কোন প্রকার নিন্দা করা আমাদিগের ঘোরতর বে আদবি। তবে চন্দ্রের সঙ্গে তাঁহাদিগের সাদৃশ্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ কলঙ্করটনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

১। তাঁহাদের প্রথম দোষ আলস্য। প্রাচীনা অত্যন্ত শ্রমশালিনী এবং গৃহকর্ম্মে সুপটু ছিলেন; নবীনা, ঘোরতর বাবু; জলের উপর পদ্মের মত স্থিরভাবে বসিয়া স্বচ্ছ দর্পণে আপনার রূপের ছায়া আপনি দেখিয়া দিন কাটান। গৃহকর্ম্মের ভার, প্রায় পরিচারিকার প্রতি সমর্পিত। ইহাতে অনেক অনিষ্ট জন্মিতেছে;—প্রথম, শারীরিক পরিশ্রমের অল্পতায়, যুবতীগণের শরীর বলশূন্য এবং রোগের আগার হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীনাদিগের, অর্থাৎ পূর্ব্বকালের যুবতীদিগের শরীর স্বাস্থ্যজনিত এক অপূর্ব্ব লাবণ্যবিশিষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহা কেবল নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখা যায়। নবীনাদিগের প্রাত্যহিক রোগভোগে তাহাদিগের স্বামী পিতা পুত্র প্রভৃতি সর্ব্বদা জ্বালাতন এবং অসুখী; এবং সংসারও কাজে কাজেই বিশৃঙ্খলাযুক্ত এবং দুঃখময় হইয়া উঠে। গৃহিণী রুগ্নশয্যাশায়িনী হইলে, গৃহের শ্রী থাকে না; অর্থের ধ্বংস হইতে থাকে; শিশুগণের প্রতি অযত্ন হয়; সুতরাং তাহাদিগের স্বাস্থ্যক্ষতি ও কুশিক্ষা হয়; এবং গৃহমধ্যে সর্ব্বত্র দুর্নীতির প্রচার হয়। যাহারা ভালবাসে, তাহারাও নিত্য রুগ্নের সেবার দুঃখ সহ্য করিতে পারে না; সুতরাং দম্পতীপ্রীতিরও লাঘব হইতে থাকে। এবং মাতার অকাল মৃত্যুতে শিশুগণের এমত অনিষ্ট ঘটে, যে তাহাদিগের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহারা উহার ফলভোগ করে। সত্য বটে, ইংরেজ জাতীয় স্ত্রীগণকে আলস্যপরবশ

দেখিতে পাই, কিন্তু তাহারা অশ্বারোহণ, বায়ুসেবন, ইত্যাদি অনেকগুলি স্বাস্থ্যরক্ষক শারীরিক ক্রিয়া নিয়মিতরূপে সম্পাদন করে। আমাদিগের গৃহপিঞ্জরের বিহঙ্গিনীগণের সে সকল কিছুই হয় না।

দ্বিতীয়, স্ত্রীগণের আলস্যের আর একটি গুরুতর কুফল এই যে সন্তান দুর্ব্বল এবং ক্ষীণজীবী হয়। শিশুদিগের নিত্য রোগ, এবং অকালমৃত্যু অনেক সময়েই জননীর শ্রমে অনুরাগশূন্যতার ফল। অনেকে বলেন, আগে এত রোগ ছিল না; এখন নিত্য পীড়া; আগে লোকে দীর্ঘজীবী ছিল; এক্ষণে অল্পবয়সে মরে। অনেকের বিশ্বাস আছে, এ সকল কালমহিমা; কলিতে অনৈসর্গিক ব্যাপার ঘটিতেছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জানেন যে নৈসর্গিক নিয়ম কখন কালমাহাত্ম্যে পরিবর্তিত হয় না; যদি আধুনিক বাঙ্গালিরা বহুরোগী এবং অল্পায়ু হইয়া থাকে, তবে তাহার অবশ্য নৈসর্গিক কারণ আছে সন্দেহ নাই। আধুনিক প্রসূতিগণের শ্রমে বিরতিই সেই সকল নৈসর্গিক কারণের মধ্যে অগ্রগণ্য। যে বঙ্গদেশের ভরসা লোকের শারীরিক বলোন্নতির উপর বর্ত্তিয়াছে, সেই বঙ্গদেশে জননীগণের আলস্যবশ্যতার এ রূপ বৃদ্ধি যে অতি শোচনীয় ব্যাপার তাহার সন্দেহ নাই।

আলস্যের তৃতীয় কুফল এই যে নবীনাগণ গৃহকর্ম্মে নিতান্ত অশিক্ষিতা এবং অপটু। কখনও সে সকল কাজ করেন না, এজন্য শিখেনও না, ইহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটে। প্রাচীনারা নিতান্ত ধনী না হইলে, জল তুলিতেন, বাসন মাজিতেন, উঠান ঝাঁট দিতেন; রন্ধন তাঁহাদের জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। এ কিছু বাড়াবাড়ি; নবীনাদিগের এতদূর করিতে আমরা অনুরোধ করি না; যাহার যেমন অবস্থা, সে তদনুসারে কার্য্য করিলেই যথেষ্ট; কেবল কার্পেট তুলিয়া কাল কাটাইলে, অতি

ঘৃণিতরূপে জীবননির্ব্বাহ করা হয় বিবেচনা করি। পরস্পরের সুখবর্দ্ধন জন্য সকলেরই জন্ম; যে স্ত্রী, ভূমণ্ডলে আসিয়া, শয্যায় গড়াইয়া, দর্পণ সম্মুখে কেশরঞ্জন করিয়া কার্পেট তুলিয়া, সীতার বনবাস পড়িয়া, এবং সন্তান প্রসব করিয়া কাল কাটাইলেন, আপনার ভিন্ন কাহারও সুখ বৃদ্ধি করিলেন না, তিনি পশুজাতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল হইলে হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীজন্ম নিরর্থক। এ শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণকে আমরা গলায় দড়ি দিয়া মরিতে পরামর্শ দিই; পৃথিবী তাহা হইলে অনেক নিরর্থক ভারবহনযন্ত্রণা হইতে বিমুক্তা হয়েন।

গৃহিণী গৃহকর্ম্ম না জানিলে রুগ্নগৃহিণীর গৃহের ন্যায় সকলই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে অর্থে উপকার হয় না; অর্থ অনর্থক ব্যয় হয়; দ্রব্য সামগ্রী লুঠ যায়; অর্দ্ধেক দাস দাসী এবং অপর লোক চুরি করে। বহুব্যয়েও খাদ্যাদির অপ্রতুল ঘটে; ভাল সামগ্রীর খরচ দিয়া মন্দ সামগ্রী ব্যবহার করিতে হয়; ভাল সামগ্রী গৃহস্থের কপালে ঘটে না। পৌরজনে পৌরজনে অপ্রণয় এবং কলহ ঘটিয়া উঠে। অতিথি অভ্যাগতের উপযুক্ত সম্মান হয় না। সংসার কণ্টকময় হয়।

২। নবীনাদিগের দ্বিতীয় দোষ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে। আমরা এক্ষণকার বঙ্গাঙ্গনাগণকে অধার্ম্মিক বলিতেছি না,—বঙ্গীয় যুবকদিগের তুলনায় তাঁহারা ধর্ম্মভক্ত এবং বিশুদ্ধাত্মা বটেন, কিন্তু প্রাচীনাদিগের সম্প্রদায়ের তুলনায় তাঁহারা ধর্ম্মে লঘু, সন্দেহ নাই। বিশেষ যে সকল ধর্ম্ম গৃহস্থের ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত সেই গুলিতে এক্ষণকার যুবতীগণের লাঘব দেখিয়া কষ্ট হয়।

স্ত্রীলোকের প্রথম ধর্ম্ম পাতিব্রত্য। অদ্যাপি বঙ্গমহিলাগণ পৃথিবীতলে পাতিব্রত্য ধর্ম্মে তুলনারহিতা। কিন্তু যাহা ছিল তাহা কি আর আছে? এ প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র দেওয়া যায় না।

প্রাচীনাগণের পাতিব্রত্য যেরূপ দৃঢ়গ্রন্থির দ্বারা হৃদয়ে নিবদ্ধ ছিল, পাতিব্রত্য যেরূপ তাহাদিগের অস্থি মজ্জা শোণিতে প্রবিষ্ট ছিল, নবীনাদিগেরও কি তাই? অনেকের বটে, কিন্তু অধিকাংশের কি তাই? নবীনাগণ পতিব্রতা বটে, কিন্তু যত লোকনিন্দা ভয়ে, তত ধর্ম্ম ভয়ে নহে।

তাহার পর, দানাদিতে প্রাচীনাদিগের যেরূপ মনোভিনিবেশ ছিল, নবীনাদিগের সেরূপ দেখা যায় না। প্রাচীনাগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে দানে পরমার্থের কাজ হয়। যে দান করে, সে স্বর্গে যায়। এক্ষণকার যুবতীগণের স্বর্গে বিশ্বাস তত দৃঢ় নহে; তাহাদের পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তিকামনা তত বলবতী নহে। ইংরেজী সভ্যতার ফলে, দেশে নানাবিধ সামগ্রীর প্রাচুর্য্য হওয়াতে সকলেরই অর্থের প্রয়োজন বাড়িয়াছে, স্ত্রীলোকদিগেরও বাড়িয়াছে; এজন্য দানে তাদৃশী আনুরক্তি আর নাই। তত দান করিলে, আর কুলায় না। টাকায় যে সকল সুখ কেনা যায়, তাহার সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য বাড়িয়াছে; দানের আধিক্য করিলে, এখন অনেক বাঞ্ছনীয় সুখে বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং স্ত্রীলোকে (এবং পুরুষে) আর তত দানশালী নহে।

হিন্দুদিগের একটি প্রধান ধর্ম্ম অতিথিসৎকার। যে গৃহে আসে, তাহাকে আহারাদির দ্বারা পরিতুষ্ট করণ পক্ষে এতদ্দেশীয় লোকের তুল্য কোন জাতি ছিল না। প্রাচীনাগণ এই গুণে বিশেষ গুণশালিনী ছিলেন। নবীনাদিগের মধ্যে সে ধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইতেছে। গৃহে অতিথি অভ্যাগত আসিলে, প্রাচীনেরা কৃতার্থ হইতেন, নবীনাগণ বিরক্ত হয়েন। লোককে আহার করান, প্রাচীনাদিগের প্রধান সুখ ছিল, নবীনাগণ ইহাকে ঘোরতর বিপদ মনে করেন।

ধর্ম্মে যে নবীনাগণ প্রাচীনাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার

একটি বিশেষ কারণ অসম্পূর্ণ শিক্ষা। লেখা পড়া বা অন্য প্রকারের শিক্ষা তাঁহারা যাহা কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতেই বুঝিতে পারেন যে প্রাচীন ধর্ম্মের শাসন অমূলক। অতএব তাহাতে বিশ্বাস হারাইয়া, ধর্ম্মের যে বন্ধন ছিল, তাহা হইতে বিমুক্ত হয়েন। তাহার স্থানে আর নূতন বন্ধন কিছুই গ্রন্থিবদ্ধ হইতেছে না। আমরা লেখা পড়ার নিন্দা করিতেছি না। ধর্ম্ম ভিন্ন বিদ্যার অপেক্ষা মূল্যবান্ বস্তু যে পৃথিবীতে কিছুই নাই, ইহা আমরা ভুলিয়া যাইতেছি না। তবে বিদ্যার ফল ইহা সর্ব্বত্র ঘটিয়া থাকে, যে তাহাতে চক্ষু ফুটে, মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, সত্যকে সত্য বলিয়া জানা যায়। বিদ্যার ফলে লোকে, প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রঘটিত ধর্ম্মের মূলের অলীকত্ব দেখিতে পায়; প্রাকৃতিক যে সত্য ধর্ম্ম, তাহা সত্য বলিয়া চিনিতে পারে। অতএব বিদ্যায় ধর্ম্মের ক্ষতি নাই, বরং বৃদ্ধি আছে। সচরাচর পণ্ডিতে যাদৃশ ধর্ম্মিষ্ঠ, মূর্খে তাদৃশ পাপিষ্ঠ হয়। কিন্তু অল্প বিদ্যার দোষ এই যে ধর্ম্মের মিথ্যা মূল তদ্দ্বারা উচ্ছিন্ন হয়; অথচ সত্য ধর্ম্মের প্রাকৃতিক মূল সংস্থাপিত হয় না। সেটুকু কিছু অধিক জ্ঞানের ফল। পরোপকার করিতে হইবে, এটী যথার্থ ধর্ম্মনীতি বটে। মূর্খেও ইহা জানে, এবং মূর্খদিগের মধ্যে ধর্ম্মে যাহাদের মতি আছে, তাহারাও ইহার বশবর্ত্তী হয়। তাহার কারণ এই যে এই নৈতিক আজ্ঞা প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; মূর্খের তাহাতে দৈবাজ্ঞা বলিয়া বিশ্বাস আছে। দৈববিধি লঙ্ঘন করিলে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষতিপ্রাপ্ত হইতে হইবে বলিয়া মূর্খ সে নীতির বশবর্ত্তী; পণ্ডিতও সে নীতির বশবর্ত্তী, কিন্তু তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বলিয়া তদুক্তির অনুসরণ করেন না। তিনি জানেন যে ধর্ম্মের কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে তাহা

অবশ্য পালনীয়; এবং পরোপকারবিধি সেই সকল নিয়মের ফল। অতএব এ স্থলে ধর্ম্মের ক্ষতি হইল না। কিন্তু যদি কেহ ঈদৃশ পরিমাণে মাত্র বিদ্যার আলোচনা করে যে তদ্দ্বারা প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস বিনষ্ট হয়, অথচ যতদূর বিদ্যার আলোচনায় প্রাকৃতিক ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মে, তত দূর না যায়, তবে তাহার পক্ষে ধর্ম্মের কোন মূল থাকে না। লোকনিন্দা-ভয়ই তাহাদিগের একমাত্র ধর্ম্মবন্ধন হইয়া উঠে। সে বন্ধন অতি দুর্ব্বল। আধুনিক অল্পশিক্ষিত যুবক যুবতীগণ, কিয়দংশে এই অবস্থাপন্ন; এ জন্য ধর্ম্মাংশে তাহারা প্রাচীনদিগের সমকক্ষ নহেন। যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, তাঁহাদিগের আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে আপনারা বালিকাদিগের হৃদয় হইতে প্রাচীন ধর্ম্মবন্ধন বিযুক্ত করিতেছেন, তাহার পরিবর্ত্তে কি সংস্থাপন করিতেছেন?*

---

* "নবীনা ও প্রাচীনা।" এই প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইলে পর, স্ত্রীলোকের পক্ষ হইতে যে উত্তর আছে, তাহা নিম্নলিখিত কৃত্রিম পত্র তিন খানিতে লিখিত হইয়াছিল।

তিন রকম।

নং ১

বঙ্গদর্শনে "নবীনা এবং প্রাচীনা" কে লিখিল? যিনি লিখুন, তিনি মনে করিয়াছেন, অবলা স্ত্রীজাতি কিছু কথা কহিবে না, অতএব যাহা ইচ্ছা তাহা লিখি। জানেন না যে সম্মার্জ্জনী স্ত্রীলোকেরই আয়ুধ।

ভাল, নবীন মহাশয়, আপনারা নবীনা প্রাচীনার গুণ দোষের তুলনা করিয়াছেন, নবীন ও প্রাচীনে কি তুলনা হয় না? তুলনা করিলে দোষের ভাগ কোন দিকে ভারি হইবে?

প্রাচীনের অপেক্ষা নবীনের গুণের মধ্যে দেখি, তোমরা একটু ইংরেজি শিখিয়াছ। কিন্তু ইংরেজি শিখিয়া কাহার কি উপকার করিয়াছ? ইংরেজি শিখিয়া কেরাণীগিরি শিখিয়াছ দেখিতে পাই। কিন্তু মনুষ্যত্ব? শুন, প্রাচীনে নবীনে প্রভেদ কি, বলি। প্রাচীনেরা পরোপকারী ছিলেন; তোমরা আত্মোপকারী। প্রাচীনেরা সত্যবাদী ছিলেন; তোমরা কেবল প্রিয়বাদী। প্রাচীনেরা ভক্তি করিতেন, পিতা মাতাকে; নবীনের ভক্তি করা পত্নী বা উপপত্নীকে। প্রাচীনেরা দেবতা ব্রাহ্মণের পূজা করিতেন; তোমাদের দেবতা টেস ফিরিঙ্গী, তোমাদের ব্রাহ্মণ সোনার বেনে। সত্য বটে, তাঁহারা পৌত্তলিক ছিলেন, কিন্তু তোমরা বোতলিক। জগদীশ্বরীর স্থানে, তোমরা অনেকেই ধানেশ্বরীকে স্থাপনা করিয়াছ; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের স্থানে, ব্রাণ্ডি, রম, জিন। বিয়র, সেরি, তোমাদের ষষ্ঠী মনসার মধ্যে। বঙ্গীয় বাবুর ভ্রাতৃস্নেহ, সম্বন্ধীর উপর বর্ত্তিয়াছে, অপত্যস্নেহ ঘোড়া কুক্কুরের উপর বর্ত্তিয়াছে; পিতৃভক্তি আপিসের সাহেবের উপর বর্ত্তিয়াছে, আর মাতৃভক্তি? পাচিকার উপরে। আমরা অতিথি অভ্যাগত দেখিলে মহা বিপদ মনে করি বটে, তোমরা তাহাদিগকে গলা ধাক্কা দাও। আমরা অলস; তোমরা শুধু অলস নও—তোমরা বাবু! তবে ইংরেজ বাহাদুর, নাকে দড়ি দিয়া তোমাদের ঘানিগাছে ঘুরায়, বল নাই বলিয়া ঘোর। আর আমরাও নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাই বুদ্ধি নাই বলিয়া ঘোর। আমরা লেখা পড়া শিখি নাই বলিয়া আমাদের ধর্ম্মের বন্ধন নাই, আর তোমাদের? তোমাদের ধর্ম্মের বন্ধন বড় দৃঢ়, কেন না তোমাদের সে বন্ধনের দড়ী, একদিগে শুঁড়ী আর একদিগে বারস্ত্রী টানিয়া আঁটিয়া দিতেছে; তোমরা ধর্ম্ম দড়িতে মদের কলসী গলায় বাঁধিয়া, প্রেমসাগরে

ঝাঁপ দিতেছ—গরিব "নবীনা" খুনের দায়ে ধরা পড়িতেছে। তোমাদের আবার ধর্ম্মের ভয় কি? তোমরা কি মান? ঠাকুর দেবতা? যিশুখ্রীষ্ট? ধর্ম্ম মান? পাপ পুণ্য মান? কিছু না—কেবল আমাদের এই আলতা পরা মল বেড়া শ্রীচরণ মান; সেও নাতির জ্বালায়।

শ্রীচণ্ডিকা সুন্দরী দেবী।

নং ২

সম্পাদক মহাশয়! আপনাদের শ্রীচরণে একিঙ্করীকুল, কোন দোষে দোষী? আমরা কি জানি?—আপনারা শিখাইবেন, আমরা শিখিব—আপনারা গুরু, আমরা শিষ্য,—কিন্তু শিক্ষাদান এক, নিন্দা আর। বঙ্গদর্শনে "নবীনার" প্রতি এত কটূক্তি কেন?

আমাদের সহস্র দোষ আছে স্বীকার করি। একে স্ত্রীজাতি তাতে বাঙ্গালির মেয়ে; জাতিতে কাঠ মল্লিকা, তাহাতে মরুভূমে জন্মিয়াছি—দোষ না থাকিবে কেন? তবে কতকগুলি দোষ, আপনাদেরই গুণে জন্মিয়াছে। আপনাদের গুণে, দোষে নহে। আপনারা আমাদের এত ভাল না বাসিলে, আমাদের এত দোষ ঘটিত না। আপনারা আমাদের সুখী করিয়াছেন, এজন্য আমরা অলস। মাথার ফুলটি খসিয়া পড়িলে, আপনারা তুলিয়া পরান। আপনারা জল হইয়া যে নলিনী হৃদয়ে ধারণ করেন, সে কেন স্বচ্ছ সলিলে আপনার রূপের ছায়া দেখিয়া দিন না কাটাইবে?

আমরা অতিথি অভ্যাগতের প্রতি অমনোযোগী—তাহার কারণ আমারা স্বামী পুত্রের প্রতি অধিক মনোযোগী। আমা-

দের ক্ষুদ্র হৃদয়ে আপনারা, এতস্থান গ্রহণ করিয়াছেন, যে অন্য ধর্ম্মের আর স্থান নাই।

আর—শেষ কথা, আমরা কি ধর্ম্মভীতা নহি? ছি! ধর্ম্ম-ভীতা বলিয়াই, আপনাদিগকে আর কিছু বলিতে পারিলাম না। তোমরাই আমাদিগের ধর্ম্ম। তোমাদের ভয়ে ভীতা বলিয়া, অন্য ধর্ম্মের ভয় করি না। সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম আমরা স্বামী পুত্রে সমর্পণ করিয়াছি—অন্য ধর্ম্ম জানি না। লেখা পড়া শিখাইয়া আমাদিগকে কোন ধর্ম্মে বাঁধিবেন? যত শিখান না কেন—আমরা বাঙ্গালির মেয়ে, সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া এই পাতি-ব্রত্য বন্ধনে আপনা আপনি বাঁধা পড়িব। যদি ইহাতে অধর্ম্ম হয়, সে আপনাদের দোষ, আপনাদেরই গুণ। আর, যদি আমার ন্যায় মুখরা বালিকার কথায় রাগ না করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা গুরু, আমরা শিষ্য—আপনারা আমা-দের কোন ধর্ম্ম শিখাইয়া থাকেন?

লেখা পড়া শিখিব? কেন? তোমাদের মুখচন্দ্র দেখিয়া যে সুখ, লেখা পড়ায় কি তত? তোমাদের সুখসাধনে যে ধর্ম্ম-শিক্ষা, লেখা পড়ায় কি তত? দেখ, তোমাদের দেখিয়া আমরা আত্মবিসর্জ্জন শিখিয়াছি, লেখা পড়ায় কি তাহা শিখাইবে? আর লেখা পড়া শিখিব কখন? তোমাদের মুখ ভাবিতে ভাবিতে দিন যায়, ছাই লেখা পড়া শিখিব কখন?

ছি! দাসীদিগের নিন্দা!

শ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী।

৩ নং

ভাল, কোন্ রসিকচূড়ামণি "নবীনা এবং প্রবীণা" লিখিলেন?

লেখক মহাশয়! তুমি যা বলিয়াছ, সব সত্য—একটি মিথ্যা নহে। আমরা অলস বটে,—কিন্তু আমরা অলস না হইয়া, কাজ করিয়া বেড়াইলে, তোমাদের দশা কি হইত? এ বিজরি, তোমাদের হৃদয়াকাশে স্থির না থাকিলে, কাহার প্রতি চাহিয়া, এ দীর্ঘ দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন কাটাইতে? এ সৌদামিনী স্থির না থাকিলে,তোমরা এ সংসারান্ধকারে কোথায় আলো পাইতে? আমরা কাজ করিব? করিব, ক্ষতি কি, কিন্তু দেখ যেন, আমাদের তিলেক না দেখিয়া, তোমরা তৈলশূন্য প্রদীপের মত হঠাৎ নিবিয়া বসিও না; জলশূন্য মাছের মত বার বার পুচ্ছ আছড়াইতে থাকিও না; আর রাখালশূন্য বাছুরের মত হাম্বারবে তোমাদের গৃহগোহাল পরিপূর্ণ করিও না। আমরা কাজ করিতে যাইব, কিন্তু তোমরা এ ঢল ঢল চঞ্চল রূপতরঙ্গ যে দেখিতে পাইবে না! এ কলকণ্ঠধ্বনি ক্ষণেক না শুনিলে যে গীতিমুগ্ধ হরিণের ন্যায় সংসারারণ্যে শব্দান্বেষণ করিয়া বেড়াইবে!—কপাল খানা! আবার বলেন কি না কাজ করে না!

আমরা অতিথি অভ্যাগতকে খাইতে দিই না;—দিব কি তোমরা যে ঘরে কিছু রাখ না। ইংরেজের আপিসের কি গুণ বলিতে পারি না—যাইবার সময় যাও যেন নন্দদুলাল—ফিরে এস যেন কুম্ভকর্ণ! নিজের নিজের উদর—এর একটি আধমণি বস্তা—আমরা যেই হিন্দুর মেয়ে, তাই তাহাতে কোন মতে ত্রিশ সের ঠাসিয়া দিই—তার উপর আবার অতিথি অভ্যাগত!

ধর্ম্মের বন্ধনে বাঁধিবেন? ক্ষতি নাই, কিন্তু যে একাদশী নিরামিষের বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, তার উপর এ বন্ধনে আর কাজ কি? আপনারা একাদশীর ভার নিন, আমরা লেখা পড়া শিখিয়া,—ধর্ম্মের বন্ধন আঁটো করিয়া বাঁধিতে রাজি আছি। আমার মনে বড় সাধ, একবার আপনাদিগের সঙ্গে অবস্থার

বিনির্ম্ময় করি। গালিগালাজ দিবার আগে, একবার কত সুখ দুঃখ বুঝিয়া লউন। আমরা মরিলে আপনারা, একাদশী করিবেন, নিরামিষ খাইবেন, ঠেঁটি পরিবেন, আপনারা স্বর্গারোহণ করিলে, আমরা "দ্বিতীয় সংসার" করিব—জীয়ন্তে আপনারা সন্তান প্রসব করিবেন, রন্ধাশালার তত্ত্বাবধারণ করিবেন, —বাড়ীতে বিবাহ উপস্থিত হইলে, গোঁপের উপর ঘোমটা টানিয়া বরণডালা মাথায় করিয়া, স্ত্রী আচার করিবেন, বাসর ঘরে রসের হাসি হাসিয়া বাসর জাগিবেন সুখের সীমা থাকিবে না।—আমরা যৌবনে বহি হাতে করিয়া কালেজে যাইব—বয়সকালে, ফিরিঙ্গী খোঁপার উপর, পাগড়ী তেড়া করিয়া বাঁধিয়া আপিসে যাইব—টৌনহলে নথ নাড়িয়া স্পীচ করিব,—চসমার ভিতর হইতে এই চোখের বিলোল কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিব—সাধের ধর্ম্মের দড়ি গলায় বাঁধিয়া সংসার গোহালে খোল বিচালি খাইব।—ক্ষতি কি! তোমরা বিনিময় করিবে? কিন্তু একটা কথা সাবধান করিয়া দিই—তোমরা যখন মানে বসিবে—আমরা যখন মান ভাঙ্গিতে বসিব--মুখখানি কাঁদো কাঁদো করিয়া, কর্ণভূষা একটু ঈষৎ রসের দোলনে দোলাইয়া,এই সভ্রমর সরোজনয়নে একবার চোরা চাহনি চাহিয়া, যখন গহনা পরা হাতখানি, তোমাদের পায়ে দিব—তখন? তখন [কি তোমরা, আমাদের মত মানের মান রাখিতে পারিবে?

বড়াই ছাড়িয়া, তাই কর; তোমরা অন্তঃপুরে এস—আমরা আপিসে যাই। যাহারা সাতশত বৎসর পরের জুতা মাথায় বহিতেছে তাহারা আবার পুরুষ! বলিতে লজ্জা করে না।

শ্রীরসময়ী দাসী।



বুড়া বয়সের কথা।

রাম শর্ম্মার প্রণীত।

আমি বুড়া বয়সের কথা লিখি লিখি মনে করিতেছি কিন্তু লিখিতে পারিতেছি না। হইতে পারে, যে এই নিদারুণ কথা আমার কাছে বড় প্রিয়,—আপনার মর্ম্মান্তিক দুঃখের পরিচয় আপনার কাছে বড় মিষ্ট লাগে, কিন্তু আমি লিখিলে পড়িবে কে? যে যুবা, কেবল সেই পড়ে, বুড়ায় কিছু পড়ে না। বোধ হয়, আমার এই বুড়া বয়সের কথার পাঠক যুটিবে না।

অতএব আমি ঠিক বুড়া বয়সের কথা লিখিব না। বলিতে পারি না; বৈতরণীর তরঙ্গাভিহত জীবনের সেই শেষ সোপানে আজিও পদার্পণ করি নাই; আজিও আমার পারের কড়ি সংগ্রহ করা হয় নাই। আমার মনে মনে বিশ্বাস যে সে দিন আজিও আসে নাই। তবে যৌবনেও আর আমার দাবি দাওয়া নাই; মিয়াদি পাট্টার মিয়াদ ফুরাইয়াছে। এক দিকে, মিয়াদ অতীত হইল কিন্তু বাকি বকেয়া আদায় উসুল করা হয় নাই, তাহার জন্য, কিছু পীড়াপীড়ি আছে; যৌবনের আখিরি করিয়া ফার-খতি লইতে পারি নাই। তাহার উপর মহাজনেরও কিছু ধারি; অনাবৃষ্টির দিনে অনেক ধার করিয়া খাইয়াছিলাম, শোধ দিতে পারি, এমত সাধ্য নাই। তার উপর পাটনির কড়ি সংগ্রহ করিবার সময় আসিল। আমার এমন দুঃখের সময়ের দুটো কথা বলিব, তোমরা যৌবনের সুখ ছাড়িয়া কি একবার শুনিবে না?

আগে আসল কথাটা মীমাংসা করা যাউক—আমি কি বুড়া? আমি আমার নিজের কথাই বলিতেছি এমত নহে, আমি বুড়া, না হয় যুবা, দুইয়ের এক স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু

যাঁহারই বয়সটা একটু দোটানা রকম—যাঁহারই ছায়া পূর্ব্বদিকে হেলিয়াছে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, মীমাংসা করুন দেখি, আপনি কি বুড়া। আপনার কেশগুলি, হয় ত আজিও অনিন্দ্য ভ্রমরকৃষ্ণ, হয় ত আজিও দন্ত সকল অবিচ্ছিন্ন মুক্তামালার লজ্জাস্থল, হয় ত আপনার নিদ্রা অদ্যাপি এমন প্রগাঢ়, যে দ্বিতীয় পক্ষের ভার্য্যাও তাহা ভাঙ্গিতে পারে না;—তথাপি, হয় ত আপনি প্রাচীন। নয় ত, আপনার কেশগুলি শাদা কালোয় গঙ্গা যমুনা হইয়া গিয়াছে, দশন মুক্তাপাতি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দুই একটি মুক্তা হারাইয়া গিয়াছে—নিদ্রা, চক্ষুর প্রতারণামাত্র, তথাপি আপনি যুবা। তুমি বলিবে ইহার অর্থ, "বয়সেতে বিজ্ঞ নহে, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।" তাহা নহে—আমি বিজ্ঞতার কথা বলিতেছি না, প্রাচীনতার কথা বলিতেছি। প্রাচীনতা বয়সেরই ফল, আর কিছুরই নহে। ধাতুবিশেষে কিছু তারতম্য হয়, কেহ চল্লিশে বুড়া, কেহ বিয়াল্লিশে যুবা। কিন্তু তুমি কখন দেখিবে না, যে বয়সে অধিক তারতম্য ঘটে। যে পঁয়তাল্লিশে যুবা বলাইতে চায়, সে হয় যমভয়ে নিতান্ত ভীত, নয় তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছে; যে পঁয়ত্রিশে বুড়া বলাইতে চায়, সে হয় বড়াই ভাল বাসে, নয় পীড়িত, নয় কোন বড় দুঃখে দুঃখী।

কিন্তু এই অর্দ্ধেক পথ অতিবাহিত করিয়া, প্রথম চস্‌মা খানি হাতে করিয়া, রুমাল দিয়া মুছিতে মুছিতে ঠিক বলা দায় যে আমি বুড়া হইয়াছি কি না। বুঝি বা হইয়াছি। বুঝি হই নাই। মনে মনে ভরসা আছে একটু চক্ষের দোষ হৌক, দুই একগাছা চুল পাকুক, আজিও প্রাচীন হই নাই। কই, কিছু ত প্রাচীন হয় নাই? এই চিরপ্রাচীন ভুমবনগুল ত আজিও নবীন; আমার প্রিয় কোকিলের স্বর প্রাচীন হয় নাই; আমার সৌন্দর্য্যমাখা, হীরাবসান, গঙ্গার ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গ ত প্রাচীন হয় নাই; প্রভাতের

বায়ু, বকুল কামিনীর গন্ধ, বৃক্ষের শ্যামলতা, এবং নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা, কেহ ত প্রাচীন হয় নাই—তেমনিই কোমল, তেমনই সুন্দর আছে, আমি কেবল প্রাচীন হইলাম? আমি এ কথায় বিশ্বাস করিব না। পৃথিবীতে উচ্চ হাসি ত আজিও আছে, কেবল আমার হাসির দিন গেল? পৃথিবীতে উৎসাহ, ক্রীড়া, রঙ্গ, আজিও তেমনি অপর্য্যাপ্ত, কেবল আমারই পক্ষে নাই? জগৎ আলোকময়, কেবল আমারই রাত্রি আসিতেছে? সলমন্ কোম্পানির দোকানে বজ্রাঘাত হউক, আমি এ চস্‌মা ভাঙ্গিয়া ফেলিব, আমি বুড়া বয়স স্বীকার করিব না।

তবু আসে—ছাড়ান যায় না। ধীরে ধীরে দিনে দিনে, পলে, বয়শ্চোর আসিয়া, এ দেহপুর প্রবেশ করিতেছে—আমি যাহা মনে ভাবি না কেন, আমি বুড়া, প্রতি নিশ্বাসে তাহা জানিতে পারিতেছি। অন্যে হাসে, আমি কেবল ঠোঁট হেলা-ইয়া তাহাদিগের মন রাখি। অন্যে কাঁদে, আমি কেবল লোকলজ্জায় মুখ ভার করিয়া থাকি—ভাবি ইহারা এ বৃথা কালহরণ করিতেছে কেন? উৎসাহ আমার কাছে পণ্ডশ্রম—আশা আমার কাছে আত্মপ্রতারণা। কই, আমার ত আশা ভরসা কিছু নাই? কই—দূর হৌক, যাহা নাই তাহা আর খুঁজিয়া কাজ নাই।

খুঁজিয়া দেখিব কি? যে কুসুমদাম এ জীবনকানন আলো করিত, পথিপার্শ্বে একে একে তাহা খসিয়া পড়িয়াছে। যে মুখমণ্ডল সকল ভাল বাসিতাম, একে একে অদৃশ্য হইয়াছে, না হয় রৌদ্রবিশুষ্ক বৈকালের ফুলের মত, শুকাইয়া উঠিয়াছে। কই, আর এ ভগ্ন মন্দিরে, এ পরিত্যক্ত নাট্যশালায়, এ ভাঙ্গা মজলিষে, সে উজ্জ্বলদীপাবলী কই? একে একে নিবিয়া যাইতেছে। কেবল মুখ নহে—হৃদয়! সে সরল, সে ভালবাসা

পরিপূর্ণ, সে বিশ্বাসে দৃঢ়, সৌহার্দ্দ্যে স্থির, অপরাধেও প্রসন্ন, সে বন্ধুহৃদয় কই ? নাই। কার দোষে নাই ? আমার দোষে নহে। বন্ধুরও দোষে নহে। বয়সের দোষে অথবা যমের দোষে।

তাহাতে ক্ষতি কি ? একা আসিয়াছি, একা যাইব—তাহার ভাবনা কি ? এ লোকালয়ের সঙ্গে আমার বনিয়া উঠিল না—আচ্ছা—রোখ্‌সোদ। পৃথিবি ! তুমি তোমার নিয়মিত পথে আবর্ত্তন করিতে থাক, আমি আমার অভীষ্ট স্থানে গমন করি—তোমায় আমায় সম্বন্ধ রহিত হইল—তাহাতে, হে মৃণ্ময়ি জড়-পিণ্ডগৌরবপীড়িতে বসুন্ধরে ! তোমারই বা ক্ষতি কি, আমারই বা ক্ষতি কি ? তুমি অনন্ত কাল, শূন্যপথে ঘুরিবে, আমি আর অল্প দিন ঘুরিব মাত্র। তার পরে তোমার কপালে ছাই গুলি দিয়া, যাঁর কাছে সকল জ্বালা জুড়ায়, তাঁর কাছে গিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব !

তবে, স্থির হইল এক প্রকার যে বুড়া বয়সে পড়িয়াছি। এখন কর্ত্তব্য কি ? "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ ?" এ কোন গণ্ডমূর্খের কথা। আবার বন কোথা ? এ বয়সে, এই অট্টালিকাময়ী লোকপূর্ণা আপণীসমাকুলা নগরীই বন। কেন না হে বর্ষীয়ান্ পাঠক ! তোমার আমার সঙ্গে আর ইহার মধ্যে কাহারও সহৃদয়তা নাই। বিপদকালে কেহ কেহ আসিয়া বলিতে পারে, যে "বুড়া ! তুমি অনেক দেখিয়াছ, এ বিপদে কি করিব বলিয়া দাও,—" কিন্তু, সম্পদ কালে কেহই বলিবে না, "বুড়া, আজি আমার আনন্দের দিন, তুমি আসিয়া আমাদিগের উৎসব বৃদ্ধি কর!" বরং আমোদ আহ্লাদ কালে বলিবে, "দেখ ভাই, যেন বুড়া বেটা জানিতে না পারে।" তবে আর অরণ্যের বাকি কি ?

যেখানে আগে ভাল বাসার প্রত্যাশা করিতে, এখন সেখানে তুমি কেবল ভয় বা ভক্তির পাত্র। যে পুত্র, তোমার যৌবনকালে, তাহার শৈশবকালে, তোমার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াও, অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থাতেই, ক্ষুদ্র হস্তপ্রসারণ করিয়া, তোমার অনুসন্ধান করিত,সে এখন লোকমুখে সম্বাদ লয়, পিতা কেমন আছেন। পরের ছেলে, সুন্দর দেখিয়া যাহাকে কোলে তুলিয়া, তুমি আদর করিয়াছিলে, সে এখন কালক্রমে লব্ধবয়ঃ কর্কশকান্তি,হয় ত মহাপাপিষ্ঠ,পৃথিবীর পাপস্রোত বাড়াইতেছে, হয় ত, তোমারই দ্বেষক—তুমি কেবল কাঁদিয়া বলিতে পার, "ইহাকে আমি কোলে পিঠে করিয়াছি।" তুমি যাহাকে কোলে বসাইয়া, ক, খ, শিখাইয়াছিলে, সে হয় ত এখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত,তোমার মূর্খতা দেখিয়া মনে মনে উপহাস করে। যাহাকে স্কুলের বেতন দিয়া তুমি মানুষ করিয়াছিলে, সে হয় ত এখন তোমারে টাকা ধার দিয়া, তোমারই কাছে সুদ খায়। তুমি যাহাকে শিখাইতে, হয় ত সেই তোমায় শিখাইতেছে। যে তোমার অগ্রাহ্য ছিল, তুমি আজি তার অগ্রাহ্য। আর অরণ্যের বাকি কি ?

অন্তর্জগৎ ছাড়িয়া, বহির্জগতেও এইরূপ দেখিবে। যেখানে তুমি স্বহস্তে পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলে,—বাছিয়া বাছিয়া, গোলাপ,চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, বিগ্নোনিয়া, সাইপ্রেস অরকেরিয়া আনিয়া পুঁতিয়াছিলে, পাত্রহস্তে স্বয়ং জলসিঞ্চন করিয়াছিলে, সেখানে দেখিবে, ছোলা মটরের চাস,—হারাধন পোদ, গামছা কাঁদে, মোটা মোটা বলদ লইয়া, নির্ব্বিঘ্নে লাঙ্গল দিতেছে—সে লাঙ্গলের ফাল তোমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। যে অট্টালিকা তুমি যৌবনে, অনেক সাধ মনে মনে রাখিয়া, অনেক সাধ পুরাইয়া, যত্নে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলে,যাহাতে পালঙ্ক পাড়িয়া

নয়নে, নয়নে অধরে অধরে মিলাইয়া, ইহজীবনের অনশ্বর প্রণয়ের প্রথম পবিত্র সম্ভাষণ করিয়াছিলে, হয় ত দেখিবে সে গৃহের ইষ্টক সকল দামুঘোষের আস্তাবলের সুরকির জন্য চূর্ণ হইতেছে; সে পালঙ্কের ভগ্নাংশ লইয়া কৈলাশীর মা পাচিকা, ভাতের হাঁড়িতে জ্বাল দিতেছে—আর অরণ্যের বাকি কি?

সকল জ্বালার উপর জ্বালা, আমি সেই যৌবনে, যাহাকে সুন্দর দেখিয়াছিলাম—এখন সে কুৎসিত। আমার প্রিয়বন্ধু দাসুমিত্র, যৌবনের রূপে স্ফীতকণ্ঠ কপোতের ন্যায় সগর্ব্বে বেড়াইত,—কত মাগী গঙ্গার ঘাটে, স্নানকালে তাঁহাকে দেখিয়া নমঃশিবায় নমঃ বলিয়া ফুল দিতে, "দাসু মিত্রায় নমঃ" বলিয়া ফুল দিয়াছে। এখন সেই দাসুমিত্রের শুষ্ক কণ্ঠ, পলিত কেশ, দন্তহীন, লোলচর্ম্ম, শীর্ণ কায়া। দাসুর, একটা ব্রাণ্ডি আর তিনটা মুরগী জলপানের মধ্যে ছিল,—এখন দাসু নামাবলীর ভরে কাতর, পাতে মাছের ঝোল দিলে, পাত মুছিয়া ফেলে। আর অরণ্যের বাকি কি?

গদার মাকে দেখ। যখন আমার সেই পুষ্পোদ্যানে, তরঙ্গিণী নামে যুবতী ফুল চুরি করিতে যাইত, মনে হইত নন্দন কানন হইতে সচল সপুষ্প পারিজাত বৃক্ষ আনিয়া কে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার অলকদাম লইয়া উদ্যান বায়ু ক্রীড়া করিত, তাহার অঞ্চলে কাটা বিঁধিয়া দিয়া, গোলাপগাছ রসকেলি করিত। আর আজি গদার মাকে দেখ। বকাবকি করিতে করিতে চাল ঝাড়িতেছে—মলিনবসনা, বিকটদশনা, তীব্ররসনা, —দীর্ঘাঙ্গিনী, কৃষ্ণাঙ্গিনী, কৃশাঙ্গিনী,—লোলচর্ম্ম, পলিত কেশ, শুষ্কবাহু, কর্কশ কণ্ঠ। এই সেই তরঙ্গিণী—আর অরণ্যের বাকি কি?

অতএব, স্থির, বনে যাওয়া হইবে না। তবে কি করিব—

শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং
যৌবনে বিষয়ৈষিণাং
বার্দ্ধকে মুনিবৃত্তীনাং
যোগেনান্তে তনুত্যজাম্।

সর্ব্বগুণবান্ রঘুগণের বার্দ্ধক্যের এই ব্যবস্থা কালিদাস করিয়াছেন। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি—কালিদাস চল্লিশ পার হইয়া রঘুবংশ লিখেন নাই। তিনি যে রঘুবংশ যৌবনে লিখিয়াছিলেন, এবং কুমারসম্ভব চল্লিশ পার করিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহা আমি দুইটী কবিতা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি—

প্রথম, অজবিলাপে,

ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং
তববিশ্রান্তকথং দুনোতি মাং
নিশি সুপ্তমিবৈকপঙ্কজং
বিরতাভ্যন্তর ষট্পদস্বনং।*

এটী যৌবনের কান্না।

তারপর রতিবিলাপে,

গতএব ন তে নিবর্ত্ততে
স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ।
অহমস্য দশেব পশ্যমা
মবিসহ্য ব্যসনেন ধূমিতাম্॥†

* বায়ুবশে অলকাগুলিন চালিত হইতেছে—অথচ বাক্যহীন তোমার এই মুখ রাত্রিকালে প্রমুদিত সুতরাং অভ্যন্তরে ভ্রমর-গুঞ্জনরহিত একটী পদ্মের ন্যায় আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

† তোমার সেই সখা বায়ুতাড়িত দীপের ন্যায় পরলোকে গমন করিয়াছেন, আর ফিরিবেন না। আমি নির্ব্বাপিত দীপের দশাবৎ অসহ্য দুঃখে ধূমিত হইতেছি দেখ।

এটী বুড়া বয়সের কান্না।—

তা যাই হউক, কালিদাস বুড়া বয়সের গৌরব বুঝিলে কখনও বৃদ্ধের কপালে মুনিবৃত্তি লিখিতেন না। বিস্মার্ক, মোল্টকে,ও ফ্রেডেরিক উইলিয়ম বুড়া; তাঁহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে—জর্ম্মান ঐকজাত্য কোথা থাকিত? টিয়র প্রাচীন —টিয়র মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে, ফ্রান্সের স্বাধীনতা এবং সাধারণ তন্ত্রাবলম্বন কোথা থাকিত? গ্লাডষ্টোন এবং ডিস্রেলি বুড়া—তাঁহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে, পার্লিমেণ্টের রিফর্ম্ম এবং আয়রিসচর্চ্চের ডিসেষ্টাব্লিষমেণ্ট কোথা থাকিত?

প্রাচীন বয়সই বিষয়ৈষার সময়। আমি অস্ত্র দন্ত হীন ত্রিকালের বুড়ার কথা বলিতেছি না—তাঁহারা দ্বিতীয় শৈশবে উপস্থিত। যাঁহারা আর যুবা নন বলিয়াই বুড়া, আমি তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি। যৌবন কর্ম্মের সময় বটে, কিন্তু তখন কাজ ভাল হয় না। একে বুদ্ধি অপরিপক্ক, তাহাতে আবার রাগ দ্বেষ ভোগাশক্তি, এবং স্ত্রীগণের অনুসন্ধানে, তাহা সতত হীনপ্রভ; এজন্য মনুষ্য যৌবনে সচরাচর কার্য্যক্ষম হয় না। যৌবন অতীতে মনুষ্য বহুদর্শী, স্থিরবুদ্ধি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, এবং ভোগাশক্তির অনধীন, এজন্য সেই কার্য্যকারিতার সময়। এই জন্য, আমার পরামর্শ, যে বুড়া হইয়াছি বলিয়া,কেহ স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মুনিবৃত্তির ভাণ করিবে না। বার্দ্ধক্যেও বিষয় চিন্তা করিবে।

তোমরা বলিবে, এ কথা বলিতে হইবে না; কেহই জীবন থাকিতে ও শক্তি থাকিতে বিষয়চেষ্টা পরিত্যাগ করে না। মাতৃস্তন পান অবধি উইল করা পর্য্যন্ত আবালবৃদ্ধ কেবল বিষয়ান্বেষণে বিব্রত। সত্য, কিন্তু আমি সেরূপ বিষয়ানুসন্ধানে বৃদ্ধকে নিযুক্ত করিতে চাহিতেছি না। যৌবনে যে কাজ করি-

য়াছ, সে আপনার জন্য; তার পর যৌবন গেলে যত কাজ করিবে, পরের জন্য। ইহাই আমার পরামর্শ। ভাবিওনা যে, আজিও আপনার কাজ করিয়া উঠিতে পারিলাম না—পরের কাজ করিব কি? আপনার কাজ ফুরায় না—যদি মনুষ্যজীবন লক্ষবর্ষ পরিমিত হইত, তবু আপনার কাজ ফুরাইত না—মনুষ্যের স্বার্থপরতার সীমা নাই—তাই বলি, বার্দ্ধক্যে, আপনার কাজ ফুরাইয়াছে, বিবেচনা করিয়া পরহিতে রত হও। এই মুনিবৃত্তি যথার্থ মুনিবৃত্তি। এই মুনিবৃত্তি অবলম্বন কর।

যদি বল, বার্দ্ধক্যেও যদি, আপনার জন্য হৌক, পরের জন্য হৌক, বিষয়কার্য্যে নিরত থাকিব, তবে ঈশ্বরচিন্তা করিব কবে?—পরকালের কাজ করিব কবে? আমি বলি আশৈশব পরকালের কাজ করিবে, শৈশব হইতে জগদীশ্বরকে হৃদয়ে প্রধান স্থান দিবে। যে কাজ সকল কাজের উপর কাজ, তাহা প্রাচীন কালের জন্য তুলিয়া রাখিবে কেন? শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে, সকল সময়েই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার জন্য বিশেষ অবসরের প্রয়োজন নাই—ইহার জন্য অন্য কোন কার্য্যের ক্ষতি নাই। বরং দেখিবে, ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে মিলিত হইলে সকল কার্য্যই মঙ্গলপ্রদ, যশস্কর, এবং পরিশুদ্ধ হয়।

আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকের এ সকল কথা ভাল লাগিতেছে না। তাঁহারা এতক্ষণ বলিতেছেন, তরঙ্গিণী যুবতীর কথা হইতেছিল—হইতে হইতে আবার ঈশ্বরের নাম কেন? এই মাত্র বুড়াবয়সের ঢেঁকি পাতিয়া, রসিকতার ধান ভানিতেছিলে—আবার এ শিবের গীত কেন? দোষ হইয়াছে স্বীকার করি কিন্তু মনে মনে বোধ হয়, যে সকল কাজেই একটু একটু শিবের গীত ভাল।

ভাল হউক, বা না হউক, প্রাচীনের অন্য উপায় নাই

তোমার তরঙ্গিণীহেমাঙ্গিনী সুরঙ্গিণী কুরঙ্গিণীর দল, আর আমার দিকে ঘেঁষিবে না। তোমার মিল, কোম্‌ত, স্পেন্সর, ফুয়রবাক, আর মনোরঞ্জন করিতে পারে না। তোমার দর্শন, বিজ্ঞান, সকলই অসার—সকলই অন্ধের মৃগয়া। আজিকার বর্ষার দুর্দ্দিনে,—আজি এ কালরাত্রির শেষ কুলগ্নে,—এ নক্ষত্রহীন অমাবস্যার নিশীথ মেঘাগমে—আমায় আর কে রাখিবে? এ ভবনদীর তপ্ত সৈকতে, প্রখরবাহিনী বৈতরণীর আবর্ত্তভীষণ উপকূলে—এ দুস্তর পরাবারের প্রথম তরঙ্গমালার প্রঘাতে, আর আমায় কে রক্ষা করিবে? অতিবেগে প্রবল বাতাস বহিতেছে—অন্ধকার, প্রভো! চারিদিকেই অন্ধকার! আমার এ ক্ষুদ্র ভেলা দুষ্কৃতের ভরে বড় ভারি হইয়াছে। আমায় কে রক্ষা করিবে?

